জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২

National Productivity Day 2022

০২ অক্টোবর, রবিবার

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা

Productivity to Meet the Challenges of the 4th Industrial Revolution

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

শিল্প মন্ত্রণালয়

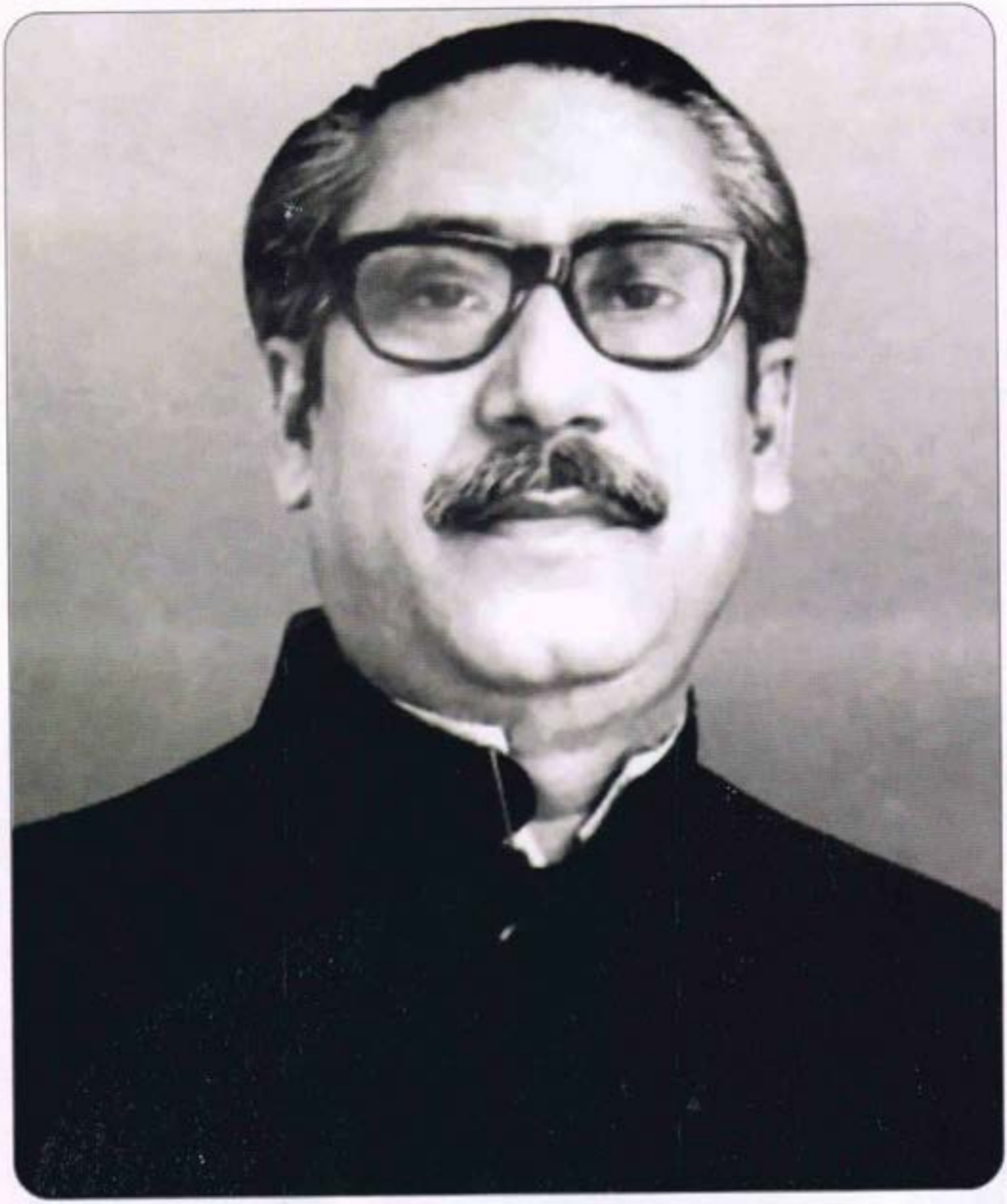

"যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান"

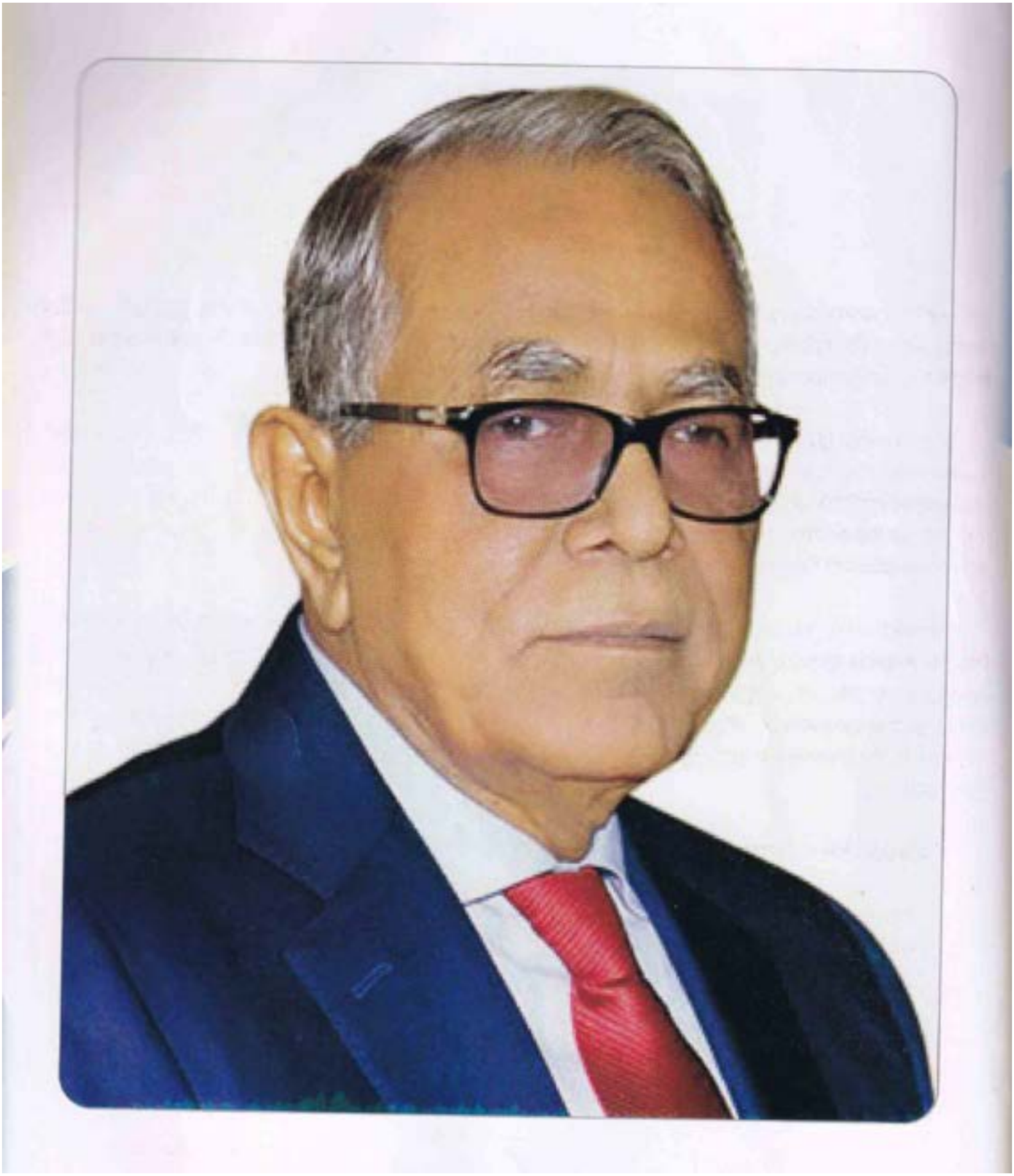

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ আশ্বিন ১৪২৯
০২ অক্টোবর ২০২২

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা' বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'রূপকল্প ২০৪১' ও 'জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০' সামনে রেখে টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি সকল শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বিশ্বে মানুষের চিন্তার জগত, জীবনধারা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন, সেবা প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। শিল্প বিপ্লবের ব্যাপকতা, প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিকতা ও সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আত্তীকরণ একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এ লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪২৯
০২ অক্টোবর ২০২২

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা'- যুগোপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অন্যতম। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হ'ল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। উৎপাদনশীলতাই উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একযোগে কাজ করতে হবে। আগামী বিশ্বে তারাই নেতৃত্ব দেবে, যারা এই বিপ্লবে সফলকাম হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি। তবেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কৌশলগত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্পখাতের সকল উৎপাদন কার্যক্রম আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা উপযোগী করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ঘটাতে হলে বাংলাদেশকে উন্নত দেশগুলোর মডেল অনুসরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে তালমিলিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দেশের সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ তথ্য ও প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণায় উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ০২ অক্টোবর দেশব্যাপী "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২" উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এটি সত্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই মহৎ উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

এই বছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা"। বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতি ও পরিবেশ বিবেচনায় প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এখন একটি বাস্তবতা। এটিকে আর অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে শিল্প বিপ্লবের ফলে। শিল্প বিপ্লবগুলো বদলে দিয়েছে সারা বিশ্বের গতিপথ, বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা।

বাংলাদেশ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নেওয়ার জন্য ভালো অবস্থানে আছে। আমাদের নেতৃত্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য সুবিধা এবং সামনে থাকা বিশাল কাজগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। সরকার জাতীয় পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রচার ও গ্রহণের সুবিধার্থে সঠিক নীতি ও প্রটোকল তৈরি করছে। এছাড়া সরকার সফটওয়্যার, ডেটা-এন্ট্রি, এবং ডেটা-প্রসেসিং শিল্প বিকাশের জন্য আইটি-ভিলেজ এবং হাই-টেক পার্ক নির্মাণের উদ্যোগও নিয়েছে। শিল্প বিপ্লবের সূচনা থেকেই শিল্প উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে আনা উৎপাদনশীলতার সম্ভাব্য লাভকে সর্বাধিক করার জন্য কোম্পানিগুলোকে অবশ্যই একাধিক উৎপাদন সুবিধা এবং প্রাসঙ্গিক মূল্য চেইনের মাধ্যমে পাইলট থেকে স্কেলে প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।

আশা করি, তৃণমূল পর্যায়ে এই দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের উদ্যোগ আরও জোরদার হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্প উন্নয়ন, শিল্প ব্যবস্থাপনা, পণ্যের মান উন্নয়ন, পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন, বর্জ্য হ্রাস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ, শিল্প, সেবা ও কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার স্তর বৃদ্ধি পাবে। এই ধরণের প্রচেষ্টা যেভাবে এমডিজি সফলভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে: সেভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২" উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি)

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এম.পি
মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর উদ্যোগে ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২ সারাদেশে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বর্তমানে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫ শতাংশ। শিল্পখাতে এসএমই খাতের উন্নয়ন, গুণগত মানসম্পন্ন অবকাঠামো সৃষ্টি, মেধা সম্পদের সুরক্ষা, শিল্প উদ্ভাবন, অ্যাক্রেডিটেশনসহ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুঘটকগুলোর অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এই তিন ধরনের শিল্পেরই বিগত বছরের চেয়ে প্রবৃদ্ধি ভালো। সেখানে রফতানিমুখী খাত ও অভ্যন্তরীণ শিল্পখাত দুটোই এগিয়েছে। অন্যদিকে কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ ও কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি প্রায় ৪১ শতাংশ। এছাড়া, কৃষি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে অনেক ক্ষেত্রে বৈশ্বিক গড় উৎপাদনশীলতাকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা আরো বৃদ্ধিতে কাজ চলমান আছে।

দেশে বর্তমানে ক্রমান্বয়ে কৃষি জমি কমছে। কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগও কমে আসছে। অন্যদিকে প্রতিবছর শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি বাড়ছে। এসব শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পের প্রসার জরুরি। সেজন্য, শিল্পখাতসহ অন্যান্য খাতেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে শিল্পায়ন আরও বাড়বে, দেশের শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা ' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। রোবোটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিখাত, শিল্পখাতসহ অন্যান্য খাতেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটি করতে পারলে ভবিষ্যতে আমাদের উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই রাখা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস নতুন প্রতিশ্রুতি তৈরি করবে ও আমাদের কর্মতৎপরতাকে আরও শাণিত করবে। আমি জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২ এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

টিপু মুনশি এম.পি
মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর ০২ অক্টোবর 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১২ সাল থেকে এ দিবস পালন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বর্তমানে দেশে প্রতিদিনই শিল্পের বিকাশ হচ্ছে। একটি দেশ উন্নত হতে হলে শিল্পের কোন বিকল্প নেই। টেকসই শিল্পায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি আমাদের বাণিজ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শিল্প ও সেবাসহ সকল খাতে উৎপাদনশীলতা যত বাড়বে দেশ তত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সকল সেক্টরে প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, পণ্যের গুণগত মান বাড়বে একই সাথে উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি ।

এবারের দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা' অত্যন্ত সময়োপযোগী। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। বর্তমান সরকার এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন শিল্প পার্ক, আইটি-ভিলেজ এবং হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করছে। যা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস ।

আমি ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২ এর সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

(টিপু মুনশি এম.পি)

কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ০২ অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" সাড়ম্বরে পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দিবসটির প্রতিপাদ্য "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা" অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য দক্ষ জনসম্পদ জরুরী। এই লক্ষ্যে ৩৯টি হাইটেক পার্ক নির্মাণসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এখন আমরা "উদ্ভাবনী বাংলাদেশ" এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। আর এই অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বজায় রাখতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করে। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এনপিও দেশের শিল্প কলকারখানা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি, উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবান করতে এ দিবস সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ দিবস ব্যাপকভাবে উদযাপনের মাধ্যমে দেশের সেবা ও শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাসহ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২" এর সার্বিক সফলতা ও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার এম.পি)

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সাল থেকে ০২ অক্টোবর "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন করে আসছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সারাদেশে উৎপাদনশীলতার ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবারের ন্যায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক এবারও দিবসটি পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে অটোমেশনের প্রভাবে দেশের উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হচ্ছে। তাই আমাদেরকে সময়ের চাহিদার আলোকে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে। প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিযোগিতায় যারা পিছিয়ে পড়বে তারা সব জায়গা থেকে বাদ পড়ে যাবে। চাহিদা মতো দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারলে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠন সম্ভব হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে দেশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে জীবনমান বাড়বে। মানুষ তার জীবনকে বেশি মাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করবে। সারা দেশে এক'শটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলেও কোটির বেশি দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন হবে। এদিকে দক্ষ জনশক্তি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন করছে। এতে দক্ষ জনশক্তি, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস'২২ এর মূল প্রতিপাদ্য- 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা' খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণা পাবে এবং এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
জয় হোক এদেশের মেহনতি মানুষের।

(বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি)

আমির হোসেন আমু এম.পি
সভাপতি
শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" ০২ অক্টোবর ২০২২ উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দিবসটির প্রতিপাদ্য **"চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা"** অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বিগত বছর সমূহে শিল্প প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ফলে বর্তমানে সরাসরি আরো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। ফলস্বরূপ, সরকারি, বেসরকারী সংস্থা এবং পেশার সকল স্তরে উন্নতির প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। এই অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বর্তমান সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শিল্প পার্ক, আইটি-ভিলেজ এবং হাই-টেক পার্ক নির্মাণ যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী মানব সম্পদ সৃষ্টি করবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিও দেশকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আমরা স্বপ্ন পূরণ করতে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হব কিন্তু আমরা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে আমরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে পারব।

আমি আশা করি ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস সফলভাবে উদযাপিত হবে।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২" এর ব্যাপক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আমির হোসেন আমু এম.পি)

জাকিয়া সুলতানা
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ০২ অক্টোবর ২০২২ দেশব্যাপী **জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস** উদযাপন করছে। আমি এ উদ্যোগের জন্য আয়োজকদের সাধুবাদ জানাই।

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অন্যতম একটি আলোচিত বিষয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন, রোবোটিকস-এর মতো ক্ষেত্রগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা জরুরি। নতুন সেবা ও পণ্য উদ্ভাবনের সঙ্গে তৈরি হবে নতুন ব্যবসা, শিল্প ও পেশা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ তথা বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার অংশ হিসেবে বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এসব পার্কে বিনিয়োগে কর অব্যাহতি, বিদেশীদের জন্য শতভাগ মালিকানার নিশ্চয়তা, আয়কর অব্যাহতিসহ নানা ধরণের সুবিধা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৭.০৭%। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে স্থায়ী করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতার অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। এ বছরের জন্য নির্ধারিত **'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা'** প্রতিপাদ্যটি খুবই সময়োপযোগী।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে নতুন প্রতিশ্রুতি এবং কর্মতৎপরতা সৃষ্টি করবে। দেশের সামগ্রিক সুষম উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা আন্দোলন একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হবে।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২' এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

(জাকিয়া সুলতানা)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
মহাপরিচালক
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দেশব্যাপী আগামী ০২ অক্টোবর **"জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস"** পালন করতে যাচ্ছে। এ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য **"চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা"** তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। শিল্পায়নের এ যুগে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনবল তৈরির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে। এর ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাও তরান্বিত হবে। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এনপিও দেশের শিল্প কলকারখানা ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আশা করি, উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে বেগবান করতে এ দিবস সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ দিবস জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী উদযাপনের মাধ্যমে দেশের সেবা ও শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাসহ তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

আমি "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২" এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা।

(মুহম্মদ মেসবাহুল আলম)

Dr. Indra Pradana Singawinata
APO Secretary-General
Tokyo

Message

On behalf of the Asian Productivity Organization (APO), I extend hearty congratulations to the Government of Bangladesh, National Productivity Organisation (NPO), and people of Bangladesh on the occasion of their 11th National Productivity Day on 2 October. This is an important continued initiative by the NPO, and this year's theme of "Productivity to Meet the Challenges of the 4th Industrial Revolution" aptly reflects the strong commitment to achieving the country's vision of becoming a developed economy by 2041. The APO joins the citizens of Bangladesh in marking this celebratory occasion.

National Productivity Day in Bangladesh is a testament to ongoing APO efforts to enhance the socioeconomic development of its members through expansion of the productivity movement in the region and beyond. The APO is pleased to contribute to the creation of Golden Bengal through various relevant projects and programs as well as to assist in achieving the goals of the government's National Productivity Master Plan 2021–30 to raise productivity and the standard of living.

It is encouraging to note that Bangladesh will celebrate Productivity Day through awareness campaigns using traditional and mass media, seminars, TV and radio talk shows, rallies, and commemorative publications on productivity and sustainable development issues. I congratulate the Ministry of Industries and NPO for organizing these events. The APO will continue to support Bangladesh in achieving its vision of becoming a more productive, sustainable economy.

I hope that the Government of Bangladesh and its people will benefit from the productivity movement while enjoying prosperity, peace, equality, and progress in the years ahead.

(Dr. Indra Pradana Singawinata)

মোঃ জসিম উদ্দিন
সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২" উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা" (Productivity to Meet the Challenges of the Fourth Industrial Revolution) যা উন্নত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে খুবই সময়োপযোগী।

উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী সক্ষমতা অর্জনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অর্জন একান্ত জরুরী। উন্নত ও টেকসই উৎপাদনশীলতা অর্জনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ডিজিটাল বিপ্লবের বিকল্প নেই। চিকিৎসা, যোগাযোগ, প্রকাশনা, সেবা ইত্যাদি খাত সর্বোপরি দেশের উৎপাদনশীলতায় জোরালো প্রভাব রাখতে শিল্পোদ্যোক্তাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, এর সদস্য চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনকে সাথে নিয়ে ইতোমধ্যে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নে কাজ শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের টেকসই উৎপাদনশীল দেশ গড়তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনপিও'র পাশাপাশি দেশের সকল শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২ এর কর্মসূচি দেশের কৃষি, শিল্প, সেবাসহ সবখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং এর মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমি 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২২'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ জসিম উদ্দিন)

President

The National Association of Small and Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB)

Message

I am happy to learn that on October 2, 2022, the National Productivity Organisation (NPO), Ministry of Industries, the Government of the People's Republic of Bangladesh will observe National Productivity Day with the theme "Productivity to Meet the Challenges of the Fourth Industrial Revolution" as part of the National Movement for improving productivity throughout the nation.

The fourth, faster than anticipated, the artificial intelligence-based industrial revolution is the one that is currently pounding on our door. The "knowledge and artificial intelligence"-based computing technology is the cornerstone of the fourth industrial revolution. The fourth industrial revolution is continually reaching new heights thanks to technologies like robotics, the Internet of Things, nanotechnology, data science, etc.

Approximately 50 million young people, or more than 30% of the population, live in Bangladesh today. In Bangladesh's situation, the youthful or productive population will continue to predominate during the ensuing 30 years. This is Bangladesh's greatest opportunity to gain from the fourth industrial revolution. In this knowledge-based industrial revolution, skilled human resources will be worth more than natural resources. The fourth industrial revolution will cause many people to lose their employment, but it will also lead to the creation of new kinds of workplaces. These modern vocations demand a high level of technical expertise.

The competitiveness of nations in the global market must be maintained and improved, and productivity and economic growth are essential components. One of the main criteria used to assess a nation's economy is its level of national competitiveness. One of the most crucial aspects of qualitative analysis is the competitiveness principle, which is used to evaluate a nation's allure and participation in international processes.

To realize the Vision 2041, Bangladesh is being transformed into a digitally empowered society and knowledge-based economy with the maximum productivity across all sectors, especially MSMEs, which play a crucial role in the national economy.

In order to plan and provide various forms of joint initiatives across the nation for the development of productivity and its sustainability, NASCIB, the first private organization in Bangladesh, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the National Productivity Organisation (NPO).

I hope National Productivity Day 2022 is a huge success.

Mirza Nurul Ghani Shovon, CIP

এনপিও এর কর্মকাণ্ডের স্থির চিত্র

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত স্টেকহোল্ডাররা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব জাকিয়া সুলতানা, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, সিনিয়র সহঃ সভাপতি, এফবিসিসিআই।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম।

গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, জনাব মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, সিনিয়র সহঃ সভাপতি, এফবিসিসিআই। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব জাকিয়া সুলতানা, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম সহ এনপিও'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

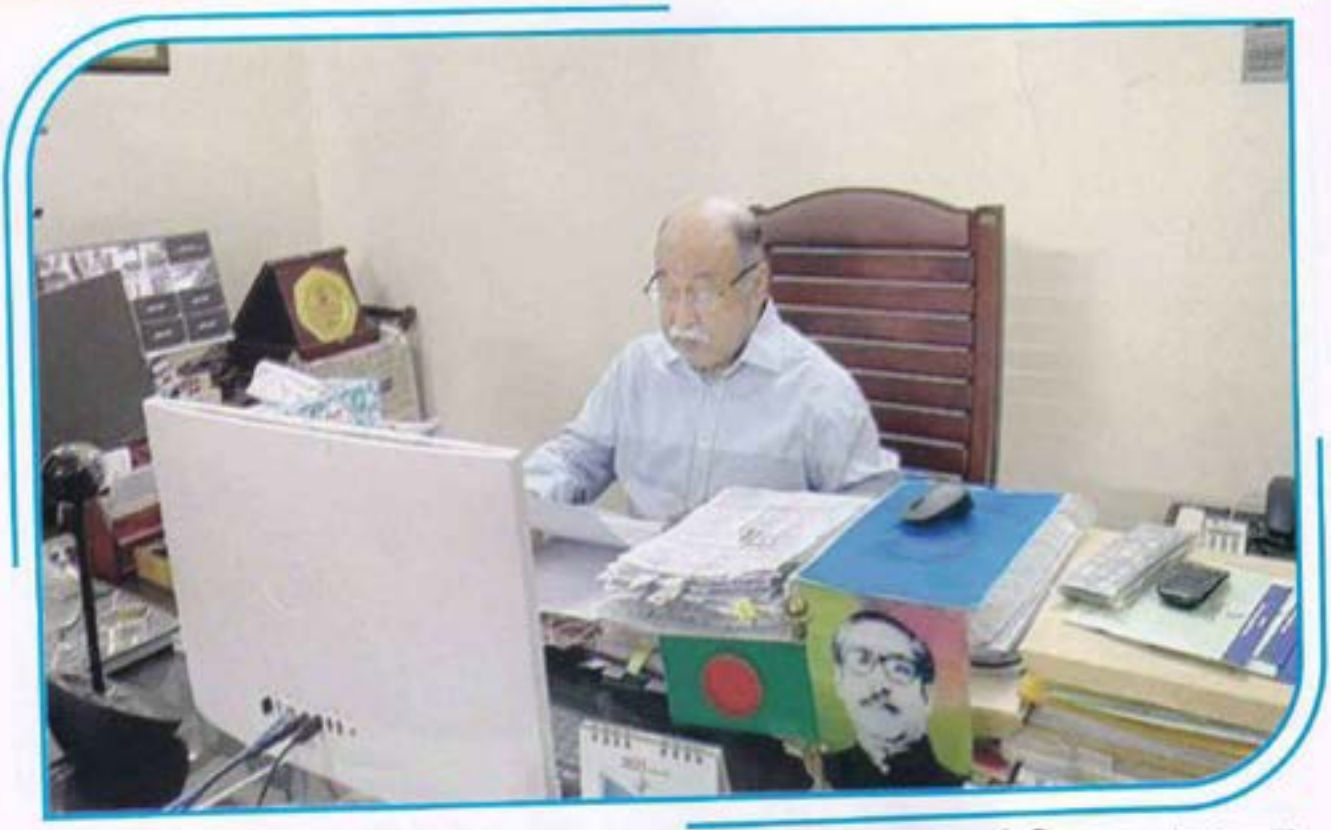

০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি।

০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি।

"অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উৎপাদনশীলতা" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ উদযাপন করা হয়। দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা এবং অন্যান্যরা।

০২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে "অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় উৎপাদনশীলতা" শীর্ষক সেমিনার এনপিও'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম, এনপিও'র পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এ টি এম আতিকুর রহমান, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীতে এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম এনপিও'র পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণে শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা মহোদয়ের সাথে এনপিও'র মহাপরিচালক ও এনপিও'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে এনপিও কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণ এনপিও 'র মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের সাথে।

১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিনে শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত তাঁর প্রতিকৃতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি ও সম্মানিত শিল্প সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানা।

১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এনপিও কার্যালয়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে নিয়ে কেক কাটছেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) ও বিকেএমইএ, ঢাকা এর যৌথ আয়োজনে গত ১২ জুন ২০২২ তারিখে বিকেএমইএ ঢাকা ভবনে Raising Consciousness on 4IR বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মনসুর আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বিকেএমইএ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড ২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও) ও বিকেএমইএ, চট্টগ্রাম এর যৌথ আয়োজনে গত ১৪ জুন ২০২২ তারিখে বিকেএমইএ ভবনে Raising Consciousness on 4IR বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, এনপিও, গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রিপন সাহা এবং র‍্যাপোর্টিয়ার হিসেবে ছিলেন পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব মোঃ রাজিব হোসাইন।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এনপিও'র সাবেক পরিচালক জনাব ড. মোঃ নজরুল ইসলাম কে সংবর্ধনা প্রদান করেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম।

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এনপিও'র সাবেক উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন কে সংবর্ধনা প্রদান করেন এনপিও'র মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ফুলকলি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড, সিলেট এর যৌথ উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী (২০-২২) অক্টোবর, ২০২১ "উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে কাইজেন দর্শন ও ব্যবহারিক প্রয়োগ" বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ মেসবাহুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) এবং ফুলকলি ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন খন্দকার।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে "প্রোডাকটিভিটি টুলস এন্ড টেকনিকের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স গত ১২-১৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কোর্সে কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন। এছাড়া রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র গবেষণা কর্মকর্তা মিজ্ নাহিদা সুলতানা রত্না এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ জায়েদ উল ইসলাম। -২৩

গত ০৩-০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন ও জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিঃ এর যৌথ উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কলাকৌশল শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন এনপিও'র উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম। এছাড়াও রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন ও আলফা এগ্রো লিমিটেড, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে গত ৩০-৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে ০২ দিনব্যাপী "উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে পরামর্শ সেবা প্রদান" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাজ ফারহানা আহমেদ, সভাপতি, ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, সভাপতি হিসেবে ছিলেন জনাব আনিকা আগা, পরিচালক, আলফা এগ্রো লিমিটেড। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন মোছাঃ আবিদা সুলতানা, উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, এনপিও এবং রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনপিও'র গবেষণা কর্মকর্তা জনাব রিপন সাহা ও পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব মোঃ ফিরোজ আহমেদ।

জেম জুট মিলস লিঃ, পঞ্চগড় এবং এনপিও এর যৌথ উদ্যোগে ২০-২১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ দুই দিনব্যাপী "সম্পদের দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেম জুট মিলস লিঃ এর প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন এনপিও'র গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোঃ আকিবুল হক এবং রিসোর্স পারসন হিসেবে ছিলেন পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব মোঃ রিপন মিয়া, এনপিও।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে রক্ত দান করেন এনপিও'র পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব এস.এম. নাইমুর রহমান।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে রক্ত দান করেন এনপিও'র পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী জনাব এ.এফ.এম. হাসান-উল-বান্না।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়		পৃষ্ঠা নং
০১	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ভূমিকা	মুহম্মদ মেসবাহুল আলম	৩৩-[illegible]
০২	Productivity and challenges of the Fourth Industrial Revolution	Md. Abu Abdullah	[illegible]
০৩	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা	মোঃ আবদুর রহমান মিঞা	[illegible]
০৪	Innovation-led Productivity Growth in Jute Industry for Middle Income Trap Avoidance in Bangladesh	Dr. Md. Mamunur Rashid	[illegible]
০৫	টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদনশীলতা	মোঃ সায়ফুল ইসলাম	৪৫-[illegible]
০৬	New Horizon of 4IR in Bangladesh: A Public Sector Productivity Perspective	Mohammad Shariful Islam	৪৭-৫৩
০৭	প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন/বৃদ্ধি	ডঃ মোঃ নজরুল ইসলাম	৫৪-৫৬
০৮	প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে নেতার নেতৃত্বের গুরুত্ব	মোঃ আব্দুল মুসাব্বির	৫৭-৬২
০৯	চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা	আওলিয়া খানম	৬৩-৬৪
১০	অপচয় রোধের মাধ্যেম উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন	এ টি এম মোজাম্মেল হক	৬৫-৬৯
১১	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগিতায়-উৎপাদনশীলতার শীর্ষের দিকে বাংলাদেশ।	আবু তৈয়ব	৭০-৭১
১২	এনপিও এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প	মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান	৭২-৭৪
১৩	উৎপাদনশীলতা, চর্তুথ শিল্প বিপ্লব এবং গবেষণা	মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম	৭৫-৮৫
১৪	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজে লাগাতে হবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড	মোঃ আসমাউল ইসলাম সিয়াম	৮৬-৮৭
১৫	The Fourth Industrial Revolution and Productivity	Ripon Saha	৮৮-৯২
১৬	The impacts of the 4IR in Bangladesh	Suraiya Subrina	৯৩-৯৬
১৭	HOW WILL THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IMPACT THE FUTURE OF JOB?	Md. Mehedi Hasan	৯৭-১০২
১৮	Importance of Business Excellence Framework to Achieve 4th Industrial Revolution	Md. Moniruzzaman	১০৩-১০৪
১৯	Increase production through reducing quality variation.	Md. Akibul Haque	১০৫-১০৬
২০	চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও লীন নীতি	নাহিদা সুলতানা রত্না	১০৭-১০৯
২১	উৎপাদনশীলতাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি	সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম	১১০-১১১
২২	৪র্থ শিল্প বিপ্লব	ফারজানা হক	১১২-১১৫
২৩	Production and Productivity in Industrial Manufacturing	Abdullah Al Zobair	১১৬-১১৭

বি.দ্র. এ স্যুভেনিরে প্রকাশিত লেখা সমূহের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ভূমিকা

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
মহাপরিচালক
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষিপ্রধান থেকে শিল্প ও সেবাপ্রধান অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আধুনিকায়ন এনেছে। টেকসই শিল্প খাত ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। দেশের চলমান এই উন্নয়নকে টেকসই করতে উৎপাদনশীল অর্থনীতির বিকল্প নেই। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সর্বক্ষেত্রে সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহার প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করার অন্যতম মাধ্যম অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে উৎপাদনশীল শিল্পায়নমুখী পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অপরিসীম ও অতুলনীয়। তাঁর দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমে দেশ আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ মাথাপিছু আয় বাড়ছে, কমছে দারিদ্র্যের হার। তাঁর সাহসিকতা এবং নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প আলোর মুখ দেখেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পর সেই জাতিকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তি দিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের চার স্তম্ভ, যথা- কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ, ই- গভর্নেন্স এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন এর আলোকে গত ১৩ বছরে নানা উদ্যোগ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে। ২০১৮ সালের ১২ মে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ প্রেরণের মাধ্যমে বিশ্ব স্যাটেলাইটের এলিট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ। দেশের সকল সরকারি অফিস এখন একই নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে পৌঁছে গেছে উচ্চগতির ইন্টারনেট। বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল সিম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটিরও বেশি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিতে মানুষের অভিযোজনের ফলে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ভোগ করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতার বর্তমান চিত্র:

আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্ব দরবারে রোল মডেল। আজকের বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক শক্তিশালী। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ ডলার। আজ পঞ্চাশ বছর পর এসে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ২১ গুণ, অর্থাৎ ২৮২৪ ডলার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে উর্ধ্বমুখী অবস্থানে রয়েছে আজকের বাংলাদেশ।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও):

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি আর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়, নিরলসভাবে নানামুখী কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নে একসাথে সামিল হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের এ যুগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প কারখানা/সেবা প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল তৈরীর পাশাপাশি মুনাফা বৃদ্ধিসহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বায়নের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৃজনশীল প্রচেষ্টায় পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি একান্তভাবে অপরিহার্য। এনপিও দেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের উৎপাদনশীলতা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে থাকে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কাজও এনপিও করে থাকে। এছাড়াও জাপানস্থ আন্তর্জাতিক সংগঠন এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এনপিও বাংলাদেশে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে

কার্যাবলি (Functions) :

- উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা;
- জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা;
- শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার গতিধারা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পরামর্শ সেবা ও কনসালটেন্সি প্রদানে প্রভাবক বা ক্যাটালিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ট্রেডবডি/অ্যাসোসিয়েশনকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ইন্সটিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান;
- প্রতি বছর ০২ অক্টোবর রাজধানীসহ দেশের সকল বিভাগ জেলা, উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন এবং এ উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন;
- জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030 বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন;
  টোকিওস্থ এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বাংলাদেশে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
- শিল্পের বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক প্রোডাকটিভিটি লেভেল নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
  উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, কনসালটেন্সী, সেমিনার, কর্মশালা, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর ব্যবস্থাপনা:

এনপিও এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও কারখানা পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার গতি সঞ্চালনে নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান, নীতিমালা প্রণয়ন ও কলাকৌশল নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ৪২ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ রয়েছে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এ পরিষদের সভাপতি। এ ছাড়া শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে। এনপিও মহাপরিচালক উক্ত কমিটি দু'টির সদস্য সচিব। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন কর্পোরেশন সমূহের চেয়ারম্যান, ট্রেডবডি/অ্যাসোসিয়েশন, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য। অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহে যথা- পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, রসায়ন শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চিনি ও খাদ্য শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি খাত, পরিবহন, আইটি, লেদার ও ট্যানারী, ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন এবং সেবা খাতে এনপিও তার কার্যক্রম বিস্তৃত রেখেছে। বর্ণিত খাতসমূহের জন্য একটি করে মোট ০৮টি উৎপাদনশীলতা উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা:

উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বিগত ০২ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুমুখী জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিম্নোক্ত ঘোষণা করেন:

১। উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা;
২। প্রতি বছর ০২ অক্টোবর 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' হিসেবে পালন; এবং
৩। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান।

উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুগান্তকারী ঘোষণা উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে আরও বেগবান ও সমৃদ্ধ করেছে। এরপর হতে প্রতি বছর ০২ অক্টোবর অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন এবং শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাঝে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও দেশব্যাপী ০২ অক্টোবর 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' পালন করা হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'চতুর্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা' অর্থাৎ 'Productivity to Meet the Challenges of the 4th Industrial Revolution'. বিভিন্ন ট্রেডবডি, অ্যাসোসিয়েশন, সেবামূলক সংগঠন, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শ্রমিক সংগঠন সমূহকে উৎপাদনশীলতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

অনুমোদিত/ প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ক) বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে (জিওবি) প্রায় ৬৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "Construction of Office Building for National Productivity Organisation (NPO) and Department of Patents, Designs & Trade-marks (DPDT) with Modern Facilities" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে ।

খ) এনপিও'র জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শিল্প, সেবা ও কৃষি সেক্টরের উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন শীর্ষক ০৩ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পটির অধীনে ইতোমধ্যে ৩৫টি সেমিনার, ২৪টি প্রশিক্ষণ ও ২৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এনপিও এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

শিল্প ও সেবা ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বছর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২১১৩ জন ব্যবস্থাপক, শিল্প উদ্যোক্তা, সুপারভাইজার এবং শ্রমিক প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । উল্লিখিত সময়ে এনপিও কর্তৃক ৯টি উৎপাদনশীলতা হ্রাস-বৃদ্ধি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান সমূহের সফলতা ও দুর্বলতার দিক চিহ্নিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নির্দেশিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় এবং আর্থিকভাবে লাভবান হতে প্রয়াস পায় । এছাড়াও ১১টি কর্মশালার মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকের সঙ্গে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণার মতবিনিময় করা হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বাংলাদেশ হতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৭৩ জন কর্মকর্তাকে এপিও প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অনলাইন পাটফর্ম এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন।

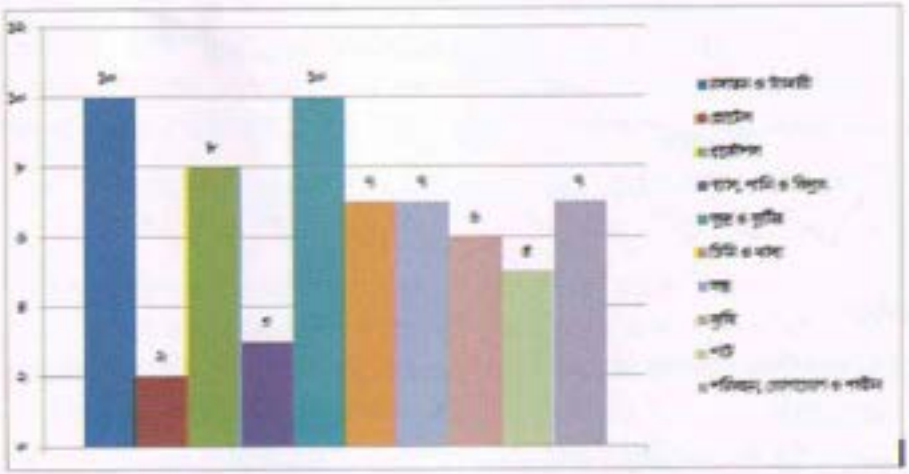

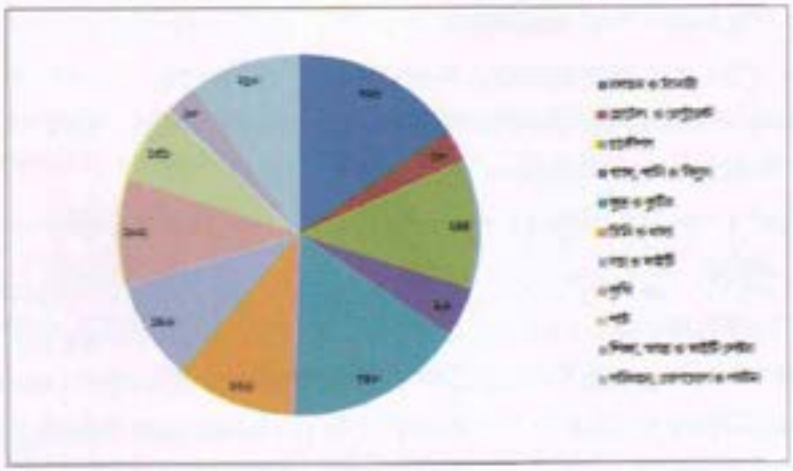

২০১১-১২ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কোর্সের চিত্র

শিল্প ও সেবা সেক্টরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ২০১১-১২ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, *প্রতি বছর প্রশিক্ষণের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছর থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে।*

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা:

এনপিও প্রতিবছর একাধিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিগত বছরগুলোতে মোট ৮টি গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

- রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল সমূহের উৎপাদনশীলতার নিম্ন হারের কারণ ও উত্তরণের উপায় (২০১৬-২০১৭)।
- বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ইস্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড এর "উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা হতে উত্তরণের উপায়" বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন (২০১৭-২০১৮)।
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট বিভাগের (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ) বিসিক শিল্প নগরীর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান অবস্থা যাচাই, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের উপায়" বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন (২০১৭-২০১৮)।
- বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের উৎপাদনশীলতা (২০১৮-২০১৯)।
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন- ঢাকা অঞ্চলের "মতিঝিল বাস ডিপো, ঢাকা ট্রাক ডিপো, কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও এবং কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, গাজীপুর এর বর্তমান অবস্থা যাচাই, সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা হতে উত্তরণের উপায়" বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন (২০১৮-২০১৯)।
- Bangladesh Leather Sector- Condition, Challenges and Strategies. (২০১৯-২০২০)
- Effectiveness of Productivity Improvement Training Program of NPO.(২০১৯-২০২০)
- Productivity Measurement and Analysis of the Ministry of Industries. (২০২০-২০২১)

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নরূপ ৩টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে।

- বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য কর্পোরেশন-এর আওতাধীন চিনিকল সমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে "Identify ways to enhance productivity of state-owned sugar mills"
- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)-এর সার কারখানার উপর "To save energy loss by reducing steam and gas leakage and recycle of condensate etc for all urea fertilizer factories"
- দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব নিয়ে "Opportunities and Challenges for Post Covid-19 in Manufacturing Sectors of Bangladesh"

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর:

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ (নাসিব), বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ইনফরমাল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই), বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি) এবং ঢাকা উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সাথে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

TES কর্মসূচি বাস্তবায়ন:

Technical Expert Service (TES) কর্মসূচির অংশ হিসাবে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) সহায়তায় এনপিও দপ্তরের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে "TES on Green Productivity for NPO Professionals" ও "TES on Productivity Measurement for NPO Professionals" ও "TES on Food Safety Management and HACCP" এবং "TES on Industrial Engineering" বিষয়ের উপর চারটি বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড -১৯ এর কারণে সকল TES কর্মসূচি অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে সর্বমোট ১৬ টি TES অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড-২০২০ প্রদান:

শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড"প্রদান করা হচ্ছে। শিল্প খাতে বিশেষ অবদানের জন্য ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০২০ এবং ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন ক্রেস্ট-২০২০ গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে হোটেল প্যান প্যাসিফিক, সোনারগাঁও এ প্রদান করা হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৬টি ক্যাটাগরিতে ২৬ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং ০১টি ট্রেডবডিকে ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ বছর ব্যাপী Bangladesh National Productivity Master Plan FY 2021-2030 প্রণয়ন:

উৎপাদনশীলতা আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এনপিও এবং এপিও এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান, প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Bangladesh National Productivity Master Plan (NPM) FY 2021-2030" একটি মহাপরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনার ০৫(পাঁচটি) Thematic Goal এর জন্য ০৫(পাঁচ) টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তরের সহযোগিতায় মহা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এছাড়া এ মহাপরিকল্পনা (Master Plan) বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে মহাপরিকল্পনা (Master Plan) সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের Annunal Performance Agreement(APA)-তে সংযুক্তকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং গত বছর জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে মহাপরিকল্পনা (Master Plan) বাস্তবায়নে এলাকাভিত্তিক Action Plan প্রস্তুতির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কার্যক্রম:

অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পুরাতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ক্রমাগতভাবে নতুন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে এসে ক্রমবর্ধমান আন্তঃসংযোগ ও স্মার্ট অটোমেশনের কারণে প্রযুক্তি, শিল্প, উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী অতি দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব নামে আখ্যায়িত হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির এরূপ অনিবার্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সফলভাবে এগিয়ে নিতে হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার নিমিত্ত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

এনপিও-এর কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃত করার জন্য এনপিওকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে এনপিও'র জনবল বৃদ্ধির অনুমোদন পাওয়া গেছে । দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক, বিভাগীয় অফিস ও শিল্পঘন স্থানের জন্য পৃথক অফিস স্থাপন করা হলে উৎপাদনশীলতাকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করা সহজ হবে ।

এনপিও এর চ্যালেঞ্জসমূহ :

- সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্লান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়ন।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবা প্রদান।
- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এনপিও প্রদত্ত সুপারিশ/পরামর্শ বাস্তবায়ন।
- উৎপাদনশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের অপ্রাপ্যতা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- এনপিও দপ্তরকে অধিদপ্তর এ উন্নীতকরণ।
- বিভাগীয় শহরে এনপিও'র অফিস স্থাপন।
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতার লেভেল পরিমাপ করা।
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/পরামর্শ ও গবেষণার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- উৎপাদনশীলতা বিষয়ক নীতিমালা/আইন প্রণয়ন।

উপসংহারঃ

একটি দেশে যেসব সম্পদ থাকে সেগুলোর মধ্যে মানব সম্পদই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কেবলমাত্র মানুষের দ্বারাই সবকিছুর যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং পরিচালনা সম্ভব। আর এই পরিচালনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন কর্মদক্ষ, মেধাবী ও সৃষ্টিশীল মানব সম্পদ। বর্তমান বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং তথ্যপ্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছে তা আমাদের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিহার্য। মানব সম্পদ দক্ষ না হলে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণা জোরদার করতে হবে। সবাইকে উৎপাদনশীলতার সুফল সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাহলেই আমরা গড়তে পারব জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি,
বঙ্গবন্ধু'র স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ি

Productivity and challenges of the Fourth Industrial Revolution

Md. Abu Abdullah
Retired Additional Secretary
Government of the Pepole's
Republic of Bangladesh

Productivity is a vital challenge of the Fourth Industrial Revolution (4IR). It was also challenging during each industrial revolution in different ways.

The First Industrial Revolution used water and steam power to mechanize production. The Second used electric power to create mass production. The Third used electronics and information technology to automate production.

Now the Fourth Industrial Revolution (4IR) is building on the Third, the digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the boundaries between the physical, digital, biological, genetic engineering, robotics, 3D printing, and technological world.

The 4IR is largely driven by four specific technological developments, i. High-speed mobile internet, ii. Artificial intelligence and automation, iii. The use of big data analytics, iv. And cloud technology.

The most significant impact of 4IR will be felt in the labor market. Low-skilled and repetitive work will be carried out by machines. Machines will be able to work better and faster. In addition, new types of jobs will emerge with higher productivity and higher pay. It could also lead to more companies employing specialists' contractors and remote workers.

In the last twenty years, the use of new technology has caused disappear of many traditional jobs and created new job titles like app developers, social media marketers, and data scientists.

When factories became widespread, additional managers and employees are required to operate them. The global labor market is increasingly adopting new technologies. New technology makes it easier and faster for companies to automate routine tasks by using smart machines.

The 4IR will impact almost every industry, within the near future, we can expect to see a reduction of a member of full-time staff due to increased automation. While social workers, nurses, nuclear engineers, teachers, and writers can rest assured that they won't be replaced by robots anytime soon.

Right now, we are going through the 4IR. We are experiencing it every day, though its full magnitude is yet unknown. Now we need to strengthen our economy based on technology,

skills, brand value, and sophistication.
The Bangladesh manufacturing sector has slowly transitioned to 4IR over the years. But covid 19 pandemic has accelerated the pace. Worker shortage and supply chain disruption forced the manufacturing sector to quickly go digital.

The impact on jobs could be good, but there is no guarantee that displaced workers will be able to get new jobs without adequate skills. On-the-job training and new skills development are very much necessary for the jobs of tomorrow. Reskilling and upskilling for digital occupation are a demand of the time. Education curriculum and technology must be as per the demand of the industrial world. Therefore we need to invest in human capital and manpower development to create a workforce that will be ready to face the challenge of time.

The 4IR has given us some advantages to promote higher productivity by introducing automation. Improved the quality of our everyday life and created new markets and growth opportunities. Lower the barriers for our entrepreneurs to harvest the benefit of new technology. As well as high-paid job opportunities in our workforce have been open both at home and abroad.

Some disadvantages are also there like, a wide gap in technical skills of our workforce for evolving new system. Inequality of technical knowledge, skills, and infrastructure in comparison to the developed world is not very easy to overcome.

Data sensitivity and the rise in technology level have also led to increasing concerns over data and intellectual property privacy, ownership, and management. Cyber security risk, especially when everything has connected the risk of hacking and data tempering increased. Social inequality, unemployment, and a threat to social security could harm our economy badly.

Another major problem that may more severe due to 4IR is climate change. Many studies have shown that economic growth and technological development contribute significantly to climate change. An adverse effect of climate change has far reached impact on our country.

Despite many problems, there are many opportunities for our economy in this new technological era. Our entrepreneurs are adopting a new reality and increasing their productivity to sustain in a new competition. Our human workforce is also adopting a new reality and increasing their productivity to sustain in global competition.

Digital technology facilitates the access of all people to education and technology, giving them the chance to improve their knowledge and skills. In this way, the barriers to access to quality education and technology for all are reduced. With the improvement of work skills, the self-confidence and competitiveness of individuals increased in the labor market. This process will help to adopt the new conditions and be more productive among our workforce.

We are on the edge of 4IR, which radically impacts our daily lives. It can be an engine of our economic and knowledge growth and improve the way we live and work. We also need to be wary of its disruption and find ways to mitigate this risk. A comprehensive plan and sound policy making can help to attain at fostering inclusive and sustainable development in the era of 4IR.

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা

মোঃ আবদুর রহমান মিঞা
অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বেপজা

বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত একটি বিষয় 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রথম শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল যুক্তরাজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পানি ও বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে যান্ত্রিক উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে যা চলে বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন পর্যন্ত। এর পরপরই তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের দ্বারা ইলেক্ট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনশীলতার উদ্ভব ঘটে যা মোটামুটি গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহাল থাকে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবকে "ডিজিটাল বিপ্লব" ও বলা হয়। অন্যদিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পরিচিতি পেয়েছে 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০' হিসেবে। ২০১৫ সালে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শব্দটি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান 'ক্লাউস সোয়াব' ফরেন অ্যাফেয়ার্স সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে তারই 'দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন' নামক বইয়ে প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। ক্লাউস সোয়াব চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে নিজের লেখা প্রবন্ধে বলেছেন, "আমরা চাই বা না চাই, এতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তা চেতনা যেভাবে চলেছে, সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এখন আমরা এক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তার ভাষ্যমতে অন্যান্য শিল্প বিপ্লবের সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে প্রতিস্থাপন করেছে। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র শারীরিক নয় বরং মানসিক পরিশ্রমকেও প্রতিস্থাপন করবে। সোয়াব কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লেষে যে সকল প্রযুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে তা হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও বায়োলজি অর্থাৎ 'সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস' এর সমন্বিত রূপ। আর এই সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমে উল্লেখিত প্রযুক্তিসমূহ হলো ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), রোবটিক্স প্রযুক্তি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ন্যানো টেকনোলজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং, শতভাগ স্বয়ংক্রিয় যানবাহন ইত্যাদি যা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চতুর্থ শিল্প বিপবের মূল ভিত্তিই হচ্ছে 'জ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা' ভিত্তিক কম্পিউটিং প্রযুক্তি তথা আইওটি, এআই, রোবটিক্স, ন্যানো প্রযুক্তি, ডাটা সায়েন্স ইত্যাদি প্রযুক্তি যা প্রতিনিয়ত চতুর্থ শিল্প বিপবকে নিয়ে যাচ্ছে অনন্য এক উচ্চ মাত্রায়। চতুর্থ শিল্প বিপবের বড় প্রভাব দৃশ্যমান হবে উৎপাদনশীল কর্মবাজারে। কেননা অটোমেশন প্রযুক্তির ফলে ক্রমশঃ শিল্প-কারখানাসমূহ যন্ত্র নির্ভর হবে এবং কায়িক পরিশ্রমী কর্মী ছাঁটাই হয়ে, নিয়োগ পাবে বিভিন্ন ধরনের রোবট। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে রোবটিক্স প্রযুক্তির কারণে বিশ্বজুড়ে প্রায় আট কোটি মনুষ্য কর্মী কাজ হারাবে। তবে এমন আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে আগামী দিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের বিশেষ সম্ভাবনা। জ্ঞানভিত্তিক এ শিল্প বিপ্লবে দক্ষ মানবসম্পদই বেশি গুরুত্ব পাবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নিত্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে বিপুল জনগোষ্ঠী কাজ হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার বৈচিত্রায়িত কর্মক্ষেত্র, যার জন্য প্রয়োজন হবে উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রম নির্ভর এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতা নির্ভর কর্মের বিলুপ্তি ঘটলেও উচ্চ দক্ষতা নির্ভর যে নতুন উৎপাদনশীল কর্মবাজার সৃষ্টি হবে তা হল ডাটা সায়েন্টিস্ট, আইওটি ও এআই এক্সপার্ট, সাইবার সিকিউরিটি নিনজা, জেনেটিক নার্সিং, রোবটিক্স প্রকৌশল বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি এর ন্যায় অপ্রতিদ্বন্দী পেশার যা কি না বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বহুগুণ।

প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা সম্ভব হলে জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল ভোগ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ যদি জাপান এর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় তাহলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনীতি থেকে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক ও আপামর জীবনমানের উত্তরণ ঘটানো কোন দুঃসাধ্য কাজ নয়।

জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত নগণ্য এবং আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ মাত্র ১৫ শতাংশ। জাপান তার সকল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করেছে শুধুমাত্র জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে। টেকসই উৎপাদনশীলতায় বড় চ্যালেঞ্জই হলো জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসাবে না নিয়ে বরং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা। বর্তমান সময় পযন্ত উন্নয়নে যে সকল উন্নয়নশীল দেশ সফলতা লাভ করেছে, তাদের মূল নির্দেশক ছিল শ্রমঘন শিল্প স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্য উন্নত বিশ্বে রপ্তানীকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন। উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রমের ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে তাদের শ্রমঘন উৎপাদন কাজসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে স্থানান্তরিত করার দরুন এ বিষয়টি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে যা 'অফ-শোরিং' নামে পরিচিত। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্স প্রযুক্তি উন্নত দেশে ব্যবহারের কারণে শ্রমঘন উৎপাদনে দিন দিনই মানুষের কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাচ্ছে এবং এ শ্রম বাবদ ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট অব থিংস সংশ্লেষে প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে বর্তমানে উন্নত বিশ্ব 'অফ-শোরিং' এর পরিবর্তে 'রি-শোরিং' প্রক্রিয়ায় উন্নয়নশীল দেশ থেকে শ্রমঘন কাজ ফিরিয়ে নিচ্ছে বা আগ্রহ হারাচ্ছে। প্রক্রিয়াটি আরও ব্যাপক আকার ধারণ করলে শ্রমঘন শিল্পায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের যে স্বপ্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহ দেখেছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে অবস্থিত ইপিজেডের ভিতরের এবং বাহিরের রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহ ইতোমধ্যে প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নয়ন ও ব্যবহারের ফলে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই শিল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকেও এখন হতে "ইন্ডাস্ট্রি ৪.০" এর আলোকে তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্যমী। বেপজা দেশের ইপিজেডসমূহের মাধ্যমে রপ্তানী বহুমূখীকরণে ও বৈচিত্রায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বতর্মানে দেশের ইপিজেডসমূহে ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, গাড়ীর যন্ত্রাংশ (নিশান, টয়োটা,হিনো গাড়ীর), মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশ, ক্যামেরা লেন্স ও পার্টস, বিদ্যুৎ, বাইসাইকেল, ব্যাটারী, গলফ শ্যাফট, জুতা ও জুতার এক্সসোরিজ, টেক্সটাইল, এনার্জি সেভিং বাল্ব, আসবাবপত্র, তাঁবু, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, কসমেটিকস ও হলিউড মাস্ক, চশমা, খেলনা, পোশাক, উইগ, চিরুনি, কলম, আইল্যাশ, পাটজাত দ্রব্য, মেডেল, চাবির রিং হেয়ার ফ্যাশন এক্সেসরিজ, লুবরিকেটিং অয়েল, ওডেন কাটলারি ও মেডিক্যাল প্রোডাক্টস, পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, আউটসোল, ইনসোল ও সু- এক্সেসরিজ, ফেস মাস্ক, পিপিই, আইটিক্যাবল ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণার সাথে একাত্ম হয়ে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও যাতে নব প্রযুক্তি সংযোজন করতে পারে সেই লক্ষ্যে বেপজা কাজ করে যাচ্ছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে প্রযুক্তিগত সমস্যায় উৎপাদনে বাঁধা প্রতিহতকরণে আধুনিক নব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যাপকতা অনুধাবনপূর্বক প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রযুক্তি বিমূর্ত একটা বিষয় হলেও এটি এমন এক কৌশল যা প্রতিনিয়ত উন্নত হতে থাকে এবং উৎপাদনে গতিশীলতা আনয়ন করে। উৎপাদনশীলতা সংশ্লেষে দেশের কৃষি, নির্মাণ প্রকৌশল, তথ্য, পরিবেশ ইত্যাদি সেক্টরেও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নব প্রযুক্তি সংযোজিত হতে পারে। সকল দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রযুক্তি গ্রহণে সক্ষমতা এক নয়। সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিবেচনায় যে প্রযুক্তিটি সর্বাধিক জরুরি অথচ তা সংশ্লিষ্ট কোনো এক দেশে বিদ্যমান নেই সে প্রযুক্তিগুলো স্থানান্তর বা হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকল্পে তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আবহের সঙ্গে খাপখাওয়াতে বিভিন্ন দেশের কর্মকাণ্ডের প্রতি বিশেষ করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থ্য খাতের প্রযুক্তিতে অগ্রগতি প্রয়োজন। যেহেতু অনেক দেশেরই প্রযুক্তি উৎপাদনে সক্ষমতা নাই সেহেতু আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে সমন্বয়পূর্বক স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত দক্ষতায় যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে যাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কালে কর্মচ্যুতি হ্রাস পায় এবং উৎপাদনও যেন ব্যাহত না হয়। প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সতর্কতার সাথে এগোতে হবে যাতে তা অপ্রয়োজনীয় বা পুরাতন প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট না হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিশ্বে এমন এক পরিবর্তন নিয়ে আসতে যাচ্ছে যার ব্যাপকতা ও বিস্তার হবে বিশাল এবং যেখানে প্রযুক্তিই পাবে প্রাধান্য। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় নাই। এর পেছনে রয়েছে মানুষের মেধা ও অভিজ্ঞতার বিরতিহীন প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রম। কাজেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উৎপাদনশীলতায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? কেন একে গ্রহন করতে হবে? কিভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে? ইত্যাদি বিষয়ে আপামর সবাইকে ভাবতে হবে, অনুধাবন করতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে নিতে হবে ব্যাপক পন্থতি। প্রশ্ন হলো প্রস্তুতিটা কিভাবে হবে বা কোন কোন বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে?

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে উৎপাদনশীলতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যে ক্ষেত্র বা সেক্টরে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন তা হলোঃ

-আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন;
-প্রযুক্তির স্থানান্তর বা হস্তান্তর;
-প্রযুক্তিতে উদ্যোগ, বিনিয়োগ ও অবকাঠামো বিনির্মাণ;
-প্রযুক্তিগত গবেষণায় উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ;
-বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাজার সৃষ্টি;
-মানব কল্যাণে প্রযুক্তির সুষ্ঠু ও সুষ্ঠ ব্যবহার;
-কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন;
-জ্ঞানীয় নমনীয়তা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহন;
-কর্মসংস্থান ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (জব অ্যানালাইসিস এর আওতায় জব স্পেসিফিকেশন ও জব ডেস্ক্রিপশন যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে);
-সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিৎকরণ;
-বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা শক্তির উন্নয়ন;
-প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে প্রাতিষ্ঠানিক স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) হালনাগাদকরণের মাধ্যমে কাজের বিন্যাস ও সামগ্রিক সমন্বয় সাধন;
-মেধা ও সৃজনশীলতার লালন ও উৎকর্ষ সাধন;
-আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স) ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন;
-প্রচলিত শিক্ষাক্রমের হালনাগাদের পাশাপাশি স্টেম শিক্ষা জোরদারকরণ;
-যথাযথ 'প্রশিক্ষণ প্রয়োজন মূল্যায়ন (ট্রেনিং নীড অ্যাসেসমেন্ট/টিএনএ)' এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োজনীয় টেকসই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ; ইত্যাদি।

শেষ কথা, বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আগাম ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ বিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আইওটি, ব্লক চেইন ও রোবটিক্স ব্যবহার করতে দ্রুত কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, পাশাপাশি সৃষ্টি করতে হবে উপযোগী সুদক্ষ মানব সম্পদ। পূর্বের শিল্প বিপ্লবগুলোর মতো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবও উৎপাদনশীলতার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর মানুষের আয় বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এক অনন্য সুযোগ তৈরি করে চলেছে। তবে এ সুযোগ তাদের জন্যই হবে, যাদের এ নতুন জগতে অবারিত প্রবেশাধিকার থাকবে, যারা এর সুফল জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং নব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে নিতে পারবে। তাই সবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের দ্বার উন্মোচন করা, তথ্য-প্রযুক্তির সুফল সবার কাছে পৌঁছে দেয়া ও সচেতন করা, সেবা সহজীকরণ এবং বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরী। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধরন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম, তাই উৎপাদনশীলতায় সফলতার জন্য বা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে নিজস্ব সক্ষমতা বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক স্ব-স্ব কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

রহমান মিঞা, মোঃ আবদুর, "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: প্রস্তুতির এখনই সময়", মৃত্তিকা প্রকাশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০২১.
কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭২
রহমান, এম, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, এক্সপার্ট সিস্টেম, রোবট" (আগস্ট ২০১৭)
ইসলাম, নজরুল, "বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ", ইস্টার্ন একাডেমিক, ঢাকা, অক্টোবর ২০১৯

Innovation-led Productivity Growth in Jute Industry for Middle Income Trap Avoidance in Bangladesh

Dr. Md. Mamunur Rashid
Senior Management Counsellor
Head, Production Management Division, BIM

Innovation-led productivity is a concept which aims at developing economic growth, which is essential for a developing country like Bangladesh. In this current study, the Inventive Problem-Solving Theory known as TRIZ was utilized to develop innovation-led product development, ensuring quality, productivity, and competitive advantage for avoiding Middle Income Trap (MIT) in Bangladesh. However, the Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) approach was adopted due to inevitable circumstances. Using DEMATEL, some CSFs were identified that affect MIT of jute industries of Bangladesh. Here, fourteen CSFs were shown, from which ten CSFs were selected with the help of industry experts, but more CSFs can be used to avoid MIT using different methods. Five goals of Jute Industry regarding innovation-led productivity growth are shown in the following table:

Innovation-led Productivity Drivers	Current State of Jute	Goals
Enterprises of Jute	High numbers of low productivit SMEs including large enterprises	Broad base of productive enterprises, led by a vanguard of innovative and agile enterprises
Economic sectors of Jute	Low-productivity of Jute producinglow-value-added goods and services	Leading-edge Jute producing high-value-added goods and services
Economic structure for Jute	Simple economic structure of jute with narrow economi base	Complex economic structure characterized by deep capabilities and production of sophisticated products by jute.
Enablers	Poor business enablers constraining business operation and growth of Jute	Robust business enablers propelling development and growth of enterprises and sectors
	Weak macro enablers attractiveness of country for Jute businesses	Advanced macro enablers underpinning sustained productivity growth of the jute economy

To achieve the above five goals for focusing jute industry for avoiding MIT, it is considerable to follow the two methods TRIZ and DEMETAL. This study can be a guideline for jute industry managers, practitioners and administrators interested in embracing and overseeing sustainability concepts to mitigate MIT through innovation-led productivity development. They can also make strategic and technical decisions to leverage the potential of the jute industry in Bangladesh. Thus, this study shows two methodologies and frameworks, which are one for the TRIZ method and another for the DEMATEL method for obtaining above five goals of Jute Industry for avoiding MIT.

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদনশীলতা

মোঃ সায়ফুল ইসলাম
সভাপতি
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বাধীনতা অর্জনের পরথেকে নানা চড়াই-উতরাই এর মধ্যদিয়ে এদেশ এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিক দুর্যোগ, যেমন-সিডর, আইলা ইত্যাদি এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করেছে। শতবাধা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের উন্নয়নের ধারাকে অনেকটা বাধাগ্রস্ত করেছে। তেমনি বাংলাদেশের গতিশীল অর্থনীতির ধারাতেও এই মহামারীর প্রভাব পড়েছে। তবে, বর্তমানে বাংলাদেশ এই মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে।

দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নসহ গতিশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে বাংলাদেশ এমডিজি, এসডিজি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১৫ সালে ১৭ টি লক্ষ্য ও ১৬৯ টি টার্গেটকে সামনে রেখে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদী টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা। ২০১৬ সালের জানুয়ারী থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়।

একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য সে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সুযোগ ও অধিকারের সমতা, বৈষম্যহীন অন্তর্ভুক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ, লিঙ্গবৈষম্যহীনতা, সম্পদের সুষম বন্টন ও ব্যবহার, আইনমান্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি দেশের টেকসই উন্নয়নে সে দেশের অর্থনীতি অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাত রয়েছে। এই খাতসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে তৈরী পোশাক শিল্প, নীটওয়্যার, কৃষি খাত, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানী, পোল্ট্রি ও মৎস খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির ও শিল্প, ঔষধ শিল্প খাত ইত্যাদি। এই খাতগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কর্মশক্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ, ক্রমবর্ধমান নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সুযোগ প্রদান করে থাকে যা বাংলাদেশের অভীষ্ট লক্ষ্যগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এই খাতেসমূহের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা একটি উন্নত ভবিষ্যত গড়তে এবং তা টেকসই করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সকল খাতের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন (স্টেকহোল্ডারস) তথা সরকার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ক্রেতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাকে একত্রে কাজ করে যেতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে ১৭ টি লক্ষ্য রয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিত করা, টেকসই কৃষিব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তি ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা, অসমতা হ্রাসকরণ, শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। এক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নিশ্চিতকরণসহ কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানর্জন এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে হবে।

এসডিজির উল্লেখিত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ক্ষুধামুক্তি ও দারিদ্র্য বিমোচন, টেকসই কৃষিব্যবস্থা, খাদ্যনিরাপত্তা ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষি খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। মানুষের জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেশীরভাগ অংশ কৃষি খাতে উৎপাদিত হয়। সুতরাং, এই খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারলে তা আমাদের ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়ার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে এবং সেইসাথে দেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অবদান রাখে এমন উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর মধ্যে পোল্ট্রি ও মৎস্য খাত চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি খাতসমূহও রয়েছে। এই খাতসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারলে তা এ দেশের অর্থনীতিতে অবদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের হারকেও কমাতে সহায়তা করবে। চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য প্রস্তুত ও রপ্তানীখাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের অন্যতম একটি খাত। এদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও ঔষধ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতার ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখছে।

এছাড়াও এসডিজি অর্জনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং তরুণ-তরুণীদের তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সমতা, বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করাসহ পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

সর্বোপরি, সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা, বিভিন্ন কৌশল ও পরিকল্পনা, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, বিভিন্ন খাতসমূহের গতিশীল উৎপাদশীলতা, দক্ষ জনসমষ্টি ও সচেতনতা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লক্ষ্যগুলো ঠিক করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে কাজ করতে পারলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের যে অভীষ্ট লক্ষ্য রয়েছে তা অর্জনে সহায়ক হবে।

উৎপাদনশীলতা করলে বৃদ্ধি,
দেশের হবে সমৃদ্ধি

New Horizon of 4IR in Bangladesh: A Public Sector Productivity Perspective

Mohammad Shariful Islam
Assistant Professor of Business Administration
Bangladesh Army International University of Science and Technology

Abstract

Bangladesh has tremendously influenced by the wave of fourth industrial revolution (4IR). The key agenda of 4IR is the adoption of artificial intelligence (AI), biotechnology, genomics, robotics, internet of things, virtual reality, block chain, nanotechnology, cloud computing, 3D printing, big data. At the eve of the influx of 4IR, Bangladesh is expecting huge changes and innovation through technological transformation in different sectors. Ironically, the global adverse impact of COVID 19 pandemic severely obstructed the extent of exploration in Bangladesh. Until date, related literature, possible wave of changes, analysis in context of different sector of Bangladesh is sparse. As a result, the preparation to adopt the 4IR has delayed despite of having high intention of the government. This article will depict the future usage of 4IR, recent achievement of public sector to promote 4IR and future road map in context of public sector productivity. The outcome of the article will provide directions for the decision makers, stakeholder to adopt and adapt with the challenges of 4IR in the public sector of Bangladesh.

1. The Public Sector Productivity in Bangladesh

The public sector of Bangladesh emerged immediately after liberation war of 1971. After different regime, unstable political environment of the country the sector moved with many hurdles. Public sector services are the key organ to reflect state performance and the enterprise known as state owned enterprises. Likewise, there are multiple authorities like ministry, corporation, department, commissions control and facilitate the public sector organizations. In last few decades, the public sector exponentially expanded in service, manufacturing, and other business enterprises. There are 38 ministries and 150491.3 million employees to serve public sector (Ministry, 2022; Statistics and Research Cell, 2021). According to the recent report of the government of Bangladesh, the GDP growth recorded 7.25% and per capita GDP is USD 2723. Similarly, the per capita national income is USD 2824 where the public sector investment growth is 7.62%. Additionally, the revenue generated through national board of revenue is 3,33,000 crore(8.30%) and export growth hits 35.14% and foreign exchange reserve is USD 46 billion(Ministry of Finance., 2022). In order, keep consistent focus, strategy and guidance on productivity the national productivity organization (NPO) established in the year of 1989 under the ministry of industries.

2. Recent Achievement of Public Sector that Promotes 4IR

The digitalization in Bangladesh evolved from the state slogan of 'Digital Bangladesh by 2021' as a part of 'Charter for Change' of the present government of Bangladesh(Hossain et al., 2022). It comprises ensuring people's democracy and rights, transparency, accountability, establishing justice and ensuring delivery of government services through maximum adoption of technology (Rahman et al., 2020). In each of the industrial revolutions, new technology and inventions contribute to the improvement of industries and human lives. After gradual exploration of 3IR currently, the 4IR is reshaping how people will work and live in technology platform. The exploration of 4IR is one of the necessary of digitalization(Schwab, 2016). In Bangladesh, the 4IR is nothing but digital

transformation. The 4IR will influenced not only ICT industry, but also education, agriculture, manufacturing, health, economy, services, and many other areas. The government of Bangladesh initiated multiple venture to prepare the country and reap the maximum advantages. Recently, Cisco Digital Readiness Index revealed that, Bangladesh positioned in 126th out of 141 countries in the areas of technology governance. The reports underscored investments from the tech giants may shaping the 4IR for Bangladesh and e-commerce (Nile, 2022). Thus the achievement of digitalization evident in small, medium and large scale. As a ripple effect, this achievement may leverage the extended effort to the adoption the 4IR in next phase. Some of the remarkable achievement in few selective sector are explained below.

Table -1: Areas of achievements

Areas of achievement	Explanations
Internet Connectivity	Remarkable progress to adopt broad internet connectivity at the most of the districts. The government has undertaken multiple projects to set up broadband connectivity across the country in next five years(Sarker, 2021).
Data Center	Tier 4 and Tier 3 data centers already established, and their capacity has increased significantly.
High-Tech parks	39 high teach parks already established (Sarker, 2021)
Mobile Sector	Salient aspect of 4IR in Bangladesh is 5G connectivity. Public sector mobile 'Teletalk' already launched 5G to access high-speed data transfer. At present the mobile market is 8th largest market in the globe that creating huge employment, providing e-services in affordable cost, bill payment, automation, e-center, introducing e-governance(Rahman, 2015).
Bank and Banking System	All banks adopted online money transactions, payment of utility bills through internet, transfer of funds, facilitate online credit card. online services accelerate the number of clients, amount of deposit, loan disbursement, financial transaction, and liquidity several folds. Moreover, Mobile banking drives Bkash, Rocket and Nogod evolved to serve 24/7.
Submarine Cable	Bangladesh connected with the second submarine cable network to ensure secured connectivity with the information superhighway. It is satisfying 60% demand with 2060 gigabyte per second. Second submarine cable already on boarded and third will be set up in 2023.
E–Commerce	As of August 2021, there are more than 2000 e-commerce sites and50,000 e-commerce pages on social medias. E-commerce is now $2.5 billion's big industry with 1.5 million employees (BTRC, 2021).
ICT policy	The separate ministry has established. Besides, the government passed the national ICT policy (Hossain et al., 2022, p. 2) to mandate ICT among all spheres of people, tax and duty cut on computers, promoting ISP services etc.
Education	All public examinations, government job advertisement made available via mobile and internet. During COVID 19 the education system has highly supported by the free internet technology process.
Health	The country's 800 health centers given internet and mobile connectivity. Telemedicine services, videoconferencing for the treatment set up 2,300 set up community e-centers/ tele-centers all across the country(Hoque et al., 2014).
Machine Readable Passport	The government launched machine-readable passport (MRP), and machine-readable visa (MRV).
Banghabandhu Satellite	The launching of a satellite called Bangabandhu Satellite- 1 in 2018.

Establishment of Union Digital Center and e-governance	More than 6000 union digital center has established at the union level(Rahman et al., 2020). By turn, 4,501 union parishads in the country's 64 districts have already been included in the digital network. Integration between government to citizen (G2C), government-to-business (G2B), government-to- government (G2G), government-to-employees (G2E) and back-office processes , transparency and accountability of the government services and quick service(Rahman, 2015). Each of the government offices are using e-filling system.
Agriculture	Agricultural cultivation, livestock farming, fisheries, agro entrepreneurship providing distance agro-consultation, latest invention in agriculture, most productive methods other relevance services through online(Rahman et al., 2020).
Tax and Customs	The national board of revenue established individual and corporate tax submission e-portal, customs clearance system in every sector from trading, airports and land ports

These initiatives will strengthen the future implementation of 4IR more conducive and smarter. It means the achievement of digitalization will significantly influence 4IR adoption in public sector productivity in future.

3. Future Usage of 4IR in Public Sector of Bangladesh.

Many countries of the world's partially adopted 4IR in few areas of public sector. According to OECD report countries like USA, Canada, Korea, India, France, Thailand were adopted few of areas in the government functioning(OECD, 2019). Bangladesh is moving from primary steps of digitalization and now gradually way toward to the second stage of adoption. However, the implementation is still required collective effort from each level. Below table depicts the future usage of 4IR where strategy mapping is priority for the government to materialize the benefits of 4IR.

3.1 The Internet of Things (IOT)

The IOT should set up in following areas

- Service Management and Planning: IOT can be adopt to collect real-time data on population, water system, food supply, social services, transportation routes, zoning, and mapping.
- Job opportunities: Forecasting future job in public sector manufacturing, production, transport and supply and enterprise trading.
- National borders defense: IOT sensors, camera surveillance, drones, can set up to identity and monitor trafficking, illegal immigration, terrorism in the boarder areas.
- Smart City: Managing, tracking and controlling an entire city such as connected public transpo traffic monitoring and control, water level and flood monitoring, weather monitoring, 24/7 vide surveillance, connected street lights and many others.
- Faster responses during emergencies: Adoption of environmental sensors across various locatio to provide the information on physical changes of environment such as fire, floods or high spee winds. This information can immediately help government to act. In case a criminal is on the ru cops can get to the criminal more easily by tracking the car through IoT applications.

Water Management System: The sensors and actuators may adopt to deliver real time analysis of the water bodies in city or town. This helps plan water supply more efficiently and easily, detect problems in the system, then repair and renew, avoid sewage overflow risks and monitoring water bodies, saving energy, managing water bodies and optimizing wastewater treatment plants.

Disaster management and control: In order to save land from potential destruction, transfers quick help to the victims and helps in quick recovery from natural calamities the IoT may strong tool . Administrators and government officials track these changes and take necessary steps to prevent natural calamities. Geofencing and perimeter fencing through NFC helps in generating effective responses, Predictive data and data analysis generates awareness of the situation for constructive planning, RFIDs used for recovery from natural destruction.

Government E-services: In Bangladesh the my gov already in place. IoT adoption may helps citizens to manage government offered services and plans like online applications for identification cards, citizenship documents, and property and registration papers in less cost.

Healthcare: Programs such as virtual healthcare, smart hospitals may connect thousands of patients to doctors remotely. Doctors may have access to real time updates of their patients and IoT applications send alerts in case the health of a patient intensifies. IoT sensors can track the critical status of patients' health and send continuous reports to the doctors for further precautions.

Education: Virtual learning, smart boards, smart classrooms are helping connect students who cannot travel long distances to school. Teachers are able to track the performance of a student, manage attendance, correct answer sheets.

3.2 Biotechnology and Genomics

The applications of biotechnology should set up in following areas

The health (human and animal), agriculture, food and beverages processing, natural resources, environment, industrial processing, and bioinformatics, modern vaccine, theraphies, testes, bio-pharama, bio-theraphy, cancer detection through AI-enable image processing.

Industrial bio technology like - the production of bulk and specialty chemicals, enzymes, plastics, biofuels, bioremediation, and the extraction of natural resources such as metals and petroleum. Venture capital for life science.

Agriculture, food and beverage, natural resources, environment, industrial processing,

3.3 Robotics, AI and Big data

The robotics, AI and big data should be adopt for analytical decision and future forecast

- AI use in the healthcare significantly potential for future applications in the public sector. The machine learning, can help interpret results and suggest diagnoses, and predict risk factors to help introduce preventative measures. They can also suggest treatments and help doctors create highly individualized treatment plans. Combined with the knowledge of doctors and other medical experts, AI can lead to better accuracy, higher efficiency and more positive outcomes in the health field
- Government transport management, forecast road traffic system control, automated traffic lights, ambulances roads.
- Big data for policy analysis, measuring the wastage and accuracies,
- Physical security and cybersecurity is one of the main focus areas for governments exploring the use of AI. The term encompasses both, and can cover a broad areas including law enforcement, disaster prevention and recovery, and military and national defence. Facial recognition for criminal identifications, Monitor financial market trading, Innovative procurement, Project Management and control, mapping,
- Decentralization of decision between ministry to subordinate organization, green culture instead of producing many papers, in that case customized software apps can be extensively used
- Public services can be more apps based cloud system , to reduce physical interface

4. Future Road Map

A holistic and robust plan is necessary for future. The plan should be move with adequate action and follow up. Thus, the road map for preparedness of stakeholders to 4IR adoption can addressed in following three broad categories.

Employees Individual Effort	▪ Participate in sufficient training for self-development, learning module regarding 4IR ▪ Educate and integrate the 4IR in work design, process ▪ Highly expert with state of art technology. ▪ Preparation and readiness for technology like AI, robotics and virtual technology skill, re-skilling/upskilling
Organizational Initiatives	▪ Supportive leadership and style is necessary. ▪ Competency building for employees like creativity, critical thinking, ▪ Provide sufficient number of ICT resources. ▪ Provide ICT enabled work environment, process. ▪ Alternative work support like work from home, offshore work. ▪ Continuous development plan and awareness program. ▪ Basic awareness from the days of joining in the designated role. ▪ Technology based in house and external raining. ▪ Inter departmental knowledge sharing session. ▪ Regular follow up ICT equipment's. ▪ One stop service and trouble shooting. ▪ Engage stakeholder to interface.

State Patronization	▪ Create the techno oriented leadership in public sector' ▪ Strength the ICT in everywhere/across the country. ▪ Reducing the digital divide across the country (urban and rural) ▪ Techno friendly official work design and a strong and sustainable policy. ▪ Awareness program by each of the offices of the government. ▪ Union level IT service more stable support and friendly, e-filling ▪ Broadband focus, instead of highly rely on mobile companies ▪ Senior official ICT training for each, ministry, department and institute ▪ Strengthen the cyber security system ▪ Policies related to 4IR like connected economies, data protection, trans-border online trade, virtual currency, digital economy, ethical use of AI, IP Protection, digital currency, virtual products, start-up ecosystem, digital financing, trans-border cybercrimes. ▪ Supply of skilled resources, provide guidelines to reduce the demand- supply issues, bring academia and businesses closer . ▪ Reskill/upskill the existing resources with appropriate skills. ▪ Establish physical infrastructure to support the adoption and growth of the technologies. ▪ Establishment of R&D centers and knowledge-based technology-specific hubs.

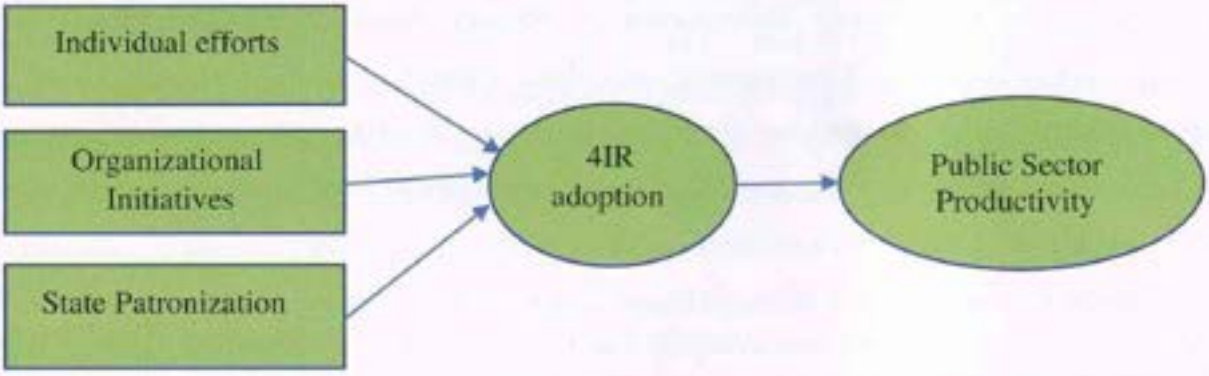

Model: The integration of 4IR with public sector productivity.

The model describes that the three components like Individual efforts, Organizational Initiatives, State Patronization will construct the 4IR adoption. As much, the components are strong, the 4IR adoption will stronger. Simultaneously the degree of 4IR adoption will leverage the extent of public sector productivity. Thus, the 4IR will significantly drives the public sector productivity.

Conclusion

The 4IR will navigate from people centric to the process centric. The process mandate high intensive, people friendly integrate technology. This will be new horizon with multiple benefits. That is why Bangladesh's will required a holistic and SMART (specific, measurable, achievable and timeliness) approach to adopt 4IR in public sector. Notably, it may challenging initially but not impossible.

References

BTRC. (2021). Mobile Phone Subscribers in Bangladesh. http://www.btrc.gov.bd/content/mobile-phone-subscribers-bangladesh-september-2021

Hoque, M. R., Mazmum, M. F. A., & Bao, Y. (2014). e-Health in Bangladesh: Current Status, Challenges, and Future Direction. The International Technology Management Review, 4(2), 87–96. https://doi.org/10.2991/itmr.2014.4.2.3

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন/বৃদ্ধি

ডঃ মোঃ নজরুল ইসলাম
অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রতিটি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অধিক মুনাফা অর্জন। তাই কলকারখানায়, ক্ষেতে খামারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শ্রমিক হতে ব্যবস্থাপনা, মালিক, রাজনীতিবিদ এমনকি সরকারের উর্ধ্বতন মহলও উৎপাদন বাড়াও বলে ময়দান প্রকম্পিত করেন। শব্দগতভাবে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা সমার্থক মনে হলেও অর্থগতভাবে এ দুটি শব্দের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মুলত উৎপাদন বলতে কেবল উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর পরিমাণকে বুঝায়। পক্ষান্তরে উৎপাদনশীলতা বলতে উৎপাদন ও উপকরণ সমূহের আনুপাতিক হারকে বুঝায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে তা সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয় কিন্তু উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ Increased production does not mean increase of productivity, but increased productivity does mean increase of production. উৎপাদন মূলত পরিমাণগত দিক (how much) এবং উৎপাদনশীলতা গুণগত দিক (how well) বিবেচনা করে। উৎপাদন কেবলমাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য পক্ষান্তরে উৎপাদনশীলতা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

উৎপাদন হল দ্রব্য ও সেবাদি সৃষ্টি সম্বন্ধীয় অপরদিকে উৎপাদনশীলতা হল উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল উপাদান সমূহের দক্ষ ও ফলদায়ক ব্যবহারকে বুঝায়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল উপাদান সমূহের সঠিক ও যথাযথ ব্যবস্থাই উৎপাদনশীলতা। উৎপাদনশীলতা পরিমাপ হল জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে এটা হল কত ভালভাবে জ্ঞানের প্রয়োগ হল তার নৈপূণ্যতা পরিমাপ। একক উৎপাদনশীলতা সংখ্যা হল অর্থহীন। যা হোক একজন ব্যবস্থাপক অধিকতর উৎসাহী বা মনোযোগী হন যখন উৎপাদনশীলতা সংখ্যার প্রবণতা প্রদর্শনে ব্যবহারিত হয়। সর্বশেষ উৎপাদনশীলতার প্রধান এবং মূল লক্ষ্য হল এর বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন। ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দুতে উৎপাদনশীলতা হল মুখরোচক এবং সরগরম বিষয়। বর্ধিত উৎপাদনশীলতা হল প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার নিশ্চিত উপায়।

উৎপাদনশীলতা অর্জিত হয় কেবল প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি এরিয়া বা ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উপাদান সমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষিত হবে । উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের আলোচনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পাঁচটি ক্ষেত্র বা এরিয়া চিহ্নিত করা হয়েছে যাকে পাঁচটি পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। এগুলি হল ঃ
পদক্ষেপ-১ ঃ উৎপাদনশীলতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেট কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টি করা, পদক্ষেপ-২ ঃ স্থায়ীভাবে দ্রব্য ও সেবাদি এবং এর উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়মিত মূল্যায়ন এবং পুনঃ নকশীকরণ করা, পদক্ষেপ-৩ ঃ প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর পরিবর্তন করা, পদক্ষেপ-৪ ঃ ব্যক্তিগত এবং দলগত সম্পর্কের উন্নয়ন করা এবং পদক্ষেপ-৫ ঃ উৎপাদনশীলতা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপ সমূহের প্রত্যেকটির একাধিক বিস্তৃতি কার্যক্রম রয়েছে।

পদক্ষেপ-১ ঃ উৎপাদনশীলতা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেট কর্মসংস্কৃতি সৃষ্টি করা ঃ সর্ব প্রথমেই প্রতিষ্ঠান/সংস্থার লক্ষ্য এবং এর মূল্যবোধ কী তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটি কী অর্জন করতে ইচ্ছুক এবং কত নিবিড়ভাবে এর সদস্যদের লক্ষ্য সমন্বয় করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নির্বাহীগণ অবশ্যই এর কর্ম সংস্কৃতি লক্ষ্য এবং মূল্যবোধের অধিকার এবং পরিবেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করবে। পদক্ষেপ-১ এর নিম্নে বর্ণিত একাধিক কার্যক্রম রয়েছে।

কার্যক্রম-১ ঃ প্রতিষ্ঠান/সংস্থাতে উৎপাদনশীলতাই হল গুরুত্বপূর্ণ এ কর্ম সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে ঃ আলোচনা এবং স্মরণে কর্ম সংস্কৃতির গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঙ্গে সভার প্রাক্কালে নৈপূণ্যতা পর্যালোচনা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনশীলতার মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা কার্যক্রমের সমর্থনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কার্যক্রম-২ ঃ উৎপাদনশীল লোকদের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরী করা ঃ উৎপাদনশীল লোকদের অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তাদের অবদান মোতাবেক ক্ষমতা এবং পুরস্কার প্রদান করতে হবে। জ্ঞান, উৎসর্গ, স্পৃহা এবং সততা মোতাবেক তাদের

চিহ্নিতকরণ পূর্বক তাদের শ্রমের ব্যবহার করতে হবে।

কার্যক্রম-৩ ঃ উৎপাদনশীলতা বীর তৈরী করা ঃ উৎপাদনশীল লোকদের মধ্য থেকে উৎপাদনশীলতা বীর চিহ্নিত করতে হবে। নির্বাহী এবং ব্যবস্থাপক সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের সকলকে জানতে দিতে হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারী, শ্রমিক যারা বীর তাদের সম্বন্ধে সকলকে জানাতে হবে এবং এক দল যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী বাহিনী তৈরী করতে হবে।

কার্যক্রম-৪ ঃ যোগসূত্র স্থাপন করা ঃ পরস্পরের লাভবান হওয়ার জন্যে একই প্রকারের এবং একই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্রতা স্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইরে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হবে। আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের তুলনার মাধ্যমে এক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা হতে অন্য প্রতিষ্ঠান লাভবান হতে পারে।

পদক্ষেপ-২ ঃ স্থায়ীভাবে দ্রব্য ও সেবাদি এবং এর উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিয়মিত মূল্যায়ন এবং পুনঃনকশীকরণ করা ঃ কারিগরী কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনের একান্ত প্রয়োজন । যদিও নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন এবং পুনঃনকশী করণ হল মূল কার্যাবলী তথাপিও প্রতিষ্ঠান মান সম্পন্ন দ্রব্য ও সেবাদি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে যা ভোক্তার নিকট পরিপূর্ণভাবে বিতরণ করা যাবে। নিয়মিতভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। পদক্ষেপ-২ এর নিম্নে বর্ণিত একাধিক কার্যক্রম রয়েছে।

কার্যক্রম-১ ঃ ভোক্তার সন্তুষ্টি ঃ ভোক্তার এবং ভোক্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। ভোক্তা কি চায় এবং প্রতিষ্ঠান কি দিতে পারে তার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্থ্যাৎ Customer satisfaction অর্থ্যাৎ যাকে বলা হয় Quality বা দ্রব্যের গুণগত মান। মনে রাখতে হবে যে Survival is not mandatory but quality is mandatory forsurvival তাই নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে বাজার বিশ্লেষণপূর্বক কিভাবে দক্ষ ও ফলপ্রসূ/কার্যকর ভাবে গুণগত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যায় তার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে ভোক্তার নিকট দ্রব্য ও সেবাদি পৌঁছানো যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

কার্যক্রম-২ ঃ দ্রব্য ও সেবাদি ব্যবহারকারীদের সঙ্গে আলোচনা বাড়ানো ঃ ভোক্তাদের সাথে মত বিনিময় করতে হবে এবং ভোক্তাদের ধারণা বিবেচনা করতে হবে। তাদের কোন পরামর্শ আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। তাদের পরামর্শ মূল্যায়ন পূর্বক তাদের প্রস্তাব মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্রব্যের নকশা এবং পরিকল্পনার সমন্বয় করতে হবে। আমরা সঠিকভাবে সঠিক ব্যবস্থা করছি কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে।

কার্যক্রম-৩ ঃ প্রস্তুতকরণ/উৎপাদন এলাকা ঃ প্রতিটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিক্ষণে দ্রব্য ও সেবাদির সংখ্যার পরিমাণ গণনা করতে হবে। মেশিন ব্রেকডাউন, পরিবর্তন, চাহিদা না থাকা, আনুসংগিক ব্যবস্থা না থাকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মেশিন বন্ধ থাকার কারণ চিহ্নিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, ফলদায়কতা এবং পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে। বন্ধ এবং চালু অবস্থায় পরিমাণ যাচাই করতে হবে। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিকভাবে দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন ও বিক্রয় পর্যালোচনা করতে হবে। এবং কর্ম পরিমাপ এবং পদ্ধতির সমীক্ষা করতে হবে।

কার্যক্রম -৪ ঃ চাতুর্যতা এবং কার্যক্রম কর্মসূচীর মূল্যায়ন ঃ সক্ষমতা দুর্বলতা, সুযোগ এবং ভীতি চিহ্নিত করতে হবে। ধারণা উদ্ভাবনী কার্যক্রমে মস্তিষ্কের ঝড় (Brain storming) পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে। উচ্চ অগ্রগন্যতা কার্যক্রম কর্মসূচী চিহ্নিত করণ পূর্বক সময় এবং প্রয়োগের অগ্রগন্যতা নির্ধারণ করতে হবে। কর্মসূচীর জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রস্তুত করতে হবে এবং পর্যালোচনা পূর্বক কর্ম পরিকল্পনা সংশোধন করতে হবে।

কার্যক্রম - ৫ ঃ প্রযুক্তি ঃ আধুনিক যুগে সর্বত্র প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। ফলে প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে। প্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রযুক্তি সদৃশকরণ করতে হবে এবং লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে।
কার্যক্রম - ৬ ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন ও পুণঃনকশীকরণ ঃ নিয়মিত উৎপাদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করতে হবে। প্রয়োজন বোধে নতুন উৎপাদন পরিকল্পনা পরিচালনা করতে হবে। লে-আউট সুবিধা পরীক্ষা করতে হবে, জ্বালানীর ব্যবহার এবং সান্তব্যতার সমন্বয় সাধন করতে হবে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন বাঞ্ছিত এবং কাম্য পরিবর্তনীয় বিষয় চিহ্নিত করতে হবে।

পদক্ষেপ -৩ ঃ প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর পরিবর্তন করা ঃ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোতে কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট রয়েছে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । প্রায়শ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধা দূর করতে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কার্যক্রম-১ ঃ আনুষ্ঠানিকতা সর্বনিম্ন পর্যায়ে কমানো ঃ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং উৎপাদনশীল হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইহা সর্বস্তরে জানানো। কমিটিতে আনুষ্ঠানিকতা, আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নির্দেশের প্রথমেই আনুষ্ঠানিকতা কার্যকরী কিন্তু এটিই লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়।

কার্যক্রম-২ ঃ খবরদারীর ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের ক্ষমতা কমানো ঃ খবরদারীর ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে বিলম্বিত করতে পারে। স্বায়ত্তশাসন, আধা স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে খবরদারিত্ব কমায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম দ্রুত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব দূর করতে হবে।

কার্যক্রম-৩ ঃ কেন্দ্রীয় করণ কমানো ঃ কেন্দ্রীয়কতা উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এ বাধা দূর করতে ব্যক্তিগত কাজের মর্যাদা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে চৌকস ব্যবস্থাপক যে সবার কাজ সম্বন্ধে অবগত এবং সকলকে উৎপাদনশীল করতে সক্ষম তাকে মধ্যস্থানে বসাতে হবে।

কার্যক্রম-৪ ঃ হীনমন্যতা হ্রাস করা ঃ তথ্য প্রবাহের উন্নয়ন করতে হবে। নিরপেক্ষ এবং দ্রুত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের হীনমনতা দূর করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হবে।

কার্যক্রম-৫ ঃ ব্যক্তিগত কার্যক্রম পর্যালোচনা ঃ কিভাবে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তির কার্যক্রম বন্টন হয় তা দেখতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে যে সঠিক লোক সঠিক স্থানে নিয়োজিত আছে (Right man in the right place)। বিদ্যমান জনবলকে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা/মূল্যায়নপূর্বক তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে এবং জনশক্তির যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হবে ।

পদক্ষেপ -৪ ঃ ব্যক্তিগত এবং দলগত সম্পর্কের উন্নয়ন করা ঃ উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন হল জনবল এবং তাদের সম্পর্কের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপকভাবে সম্পর্কযুক্ত করণ করা। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য মূলতঃ বিদ্যমান জনশক্তি এর বৈশিষ্ট্য ও এর সম্পর্কের দ্বারা অর্জিত হয়। বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জনে এখানে ব্যক্তিগত এবং দলগত সুষম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে হবে। এই সম্পর্ক উন্নয়নে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কার্যক্রম-১ ঃ উদ্বুদ্ধকরণ ঃ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সকলকে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করতে হবে। পুরস্কার এবং ইনসেনটিভ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে এবং বিশেষ ইস্যুতে নিয়মিতভাবে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে

কার্যক্রম-২ ঃ উৎপাদনশীলতা প্রত্যাশা অবতারণা করা ঃ সর্ব ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের উৎপাদনশীলতা একান্ত কাম্য । এটি নির্বাহী সহ ব্যবস্থাপকগণ এবং কর্মচারীগণকে অবহিত করতে হবে। প্রত্যেককে জানানো যে, উৎপাদনশীলতা হল প্রত্যেকেরই বিষয় এবং অবশ্য করণীয়। প্রত্যেককে জানান যে, উৎপাদনশীলরাই কেবল টিকে থাকবে (Survival of the featest)

কার্যক্রম-৩ ঃ ব্যক্তিগত ব্যবহার ঃ ভাল ব্যবহার যা দ্বারা উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব তাই প্রতিষ্ঠানের নিজস্বতা বা ওনারশীপ এর ধারণা গঠন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সর্বদা সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার পূর্বক ভাল কাজ করতে হবে। সেই সাথে ভাল ফলাফল অর্জন করা সম্ভব এবং বরাদ্দকৃত সময় নষ্ট করা উচিত নয়। উৎপাদনশীলতা বীর বা নায়ক এর ব্যবহারিক বিষয়াদি/কার্যক্রম পর্যালোচনা পূর্বক তা অন্যান্যদেরকে অনুসরণ করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

কার্যক্রম-৪ ঃ উৎপাদনশীলতা অর্জনকে মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে দেখা ঃ নিশ্চয়তা দিতে হবে যে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মর্যাদা প্রদান করা হবে। নতুন লোক বা নতুন দলকে উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত মর্যাদা বা পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

পদক্ষেপ -৫ ঃ উৎপাদনশীলতা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা ঃ উৎপাদনশীলতা অর্জনের সর্বশেষ অস্ত্র হলো ব্যবস্থাপনা যা ঐতিহ্যগত ভাবে কয়েকটি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় । যেমন- পরিকল্পনা, সংগঠন ও উন্নয়ন, বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করা । লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগুলো সমন্বিতভাবে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

কার্যক্রম-১ ঃ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা করা ঃ প্রতিষ্ঠানের অধিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বলা হয়ে থাকে Plan without work is merely a dream and work without plan is just passes the time, both plan and work can change the world! তাই সঠিক ভাবে পরিকল্পনাও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্বীকার করা যে উৎপাদনশীলতা হঠাৎ বা দুর্ঘটনা থেকে অর্জন হয় না

কার্যক্রম-২ ঃ উৎপাদনশীলতার জন্য সংগঠিত করা ঃ উৎপাদনশীলভাবে সমস্ত উপকরণসমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদনশীলভাবে সমস্ত উপকরণসমূহের বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি উপকরণসমূহের পৃথক অবদানই হল উৎপাদনশীলতা।

কার্যক্রম-৩ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পদ্ধতির উন্নয়ন ঃ জনশক্তি হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি এ বিষয়টির স্বীকৃতি দেওয়া। উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে হবে। চীনা দার্শনিক কুন ফুসিয়ানের মতে তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা কর তবে ধান গাছ লাগাও আর তুমি যদি দশ বছরের পরিকল্পনা কর তবে ফল গাছ লাগাও আর তুমি যদি একশ বছরের পরিকল্পনা কর তবে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করতে জনশক্তির উন্নয়ন কর।

কার্যক্রম-৪ ঃ উৎপাদনশীলতার স্তর মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা ঃ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকে সাংগঠনিক কাঠামো উৎপাদনশীলতার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। নিয়মিতভাবে উৎপাদনশীলতার স্তর মূল্যায়ন পূর্বক সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কার্যক্রম-৫ ঃ উৎপাদনশীলতার নিয়ম/আদর্শ সৃষ্টি করা ঃ উৎপাদনশীলতার নিয়ম/আদর্শের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে। উৎপাদনশীলতার নিয়ম/আদর্শ স্থাপন করতে হবে। উৎপাদনশীলতার নিয়ম/আদর্শ ধনাত্বক পরিবর্তন সর্বদা কাম্য। এই বিষয়ে ঋণাত্বক পরিবর্তন সর্বদা পরিত্যাজ্য। সমতার ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতার হিস্যা বন্টন করতে হবে ।

উৎপাদন ও উপাদানের হারকে উৎপাদনশীলতা বলা হয়ে থাকে। এই হার পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, কোন শিল্প কারখানা এর উৎপাদনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সমর্থ হচ্ছে কিনা । উৎপাদন বাড়লেই উৎপাদনশীলতা বাড়ে এই কথা যেমন সব সময় সঠিক নয় তেমনি উৎপাদন বাড়লেই কোন শিল্প কারখানা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এ কথা সব সময় ঠিক নয় । বাস্তবিক পক্ষে কেবল বর্ধিত উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কারখানা/প্রতিষ্ঠান লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে ।

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে নেতার নেতৃত্বের গুরুত্ব

মোঃ আব্দুল মুসাব্বির
যুগ্ম পরিচালক(অবঃ) ও কনসালটেন্ট
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)

সদা পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মাধ্যমে যে কোন দলকে সুশৃঙ্খলভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন দলনেতা অন্যতম প্রধান দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজন নেতার যোগ্য নেতৃত্বের জন্য তাকে হতে হবে বহু মাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী। কোম্পানীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল নেতা দলকে এমনভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে যাতে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্য তাদের সম্পাদিত কাজকে অবশ্যই উৎপাদনশীল করতে পারে। উৎপাদনশীলতা কর্মীদের অনুপ্রাণিত করবে, মনোবল বাড়াবে এবং আরও ইতিবাচক কাজের পরিবেশ তৈরি করবে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নাই। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত স্বল্প সময়ে কম খরচে অধিক গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য ওয়ারেন্টিসহ কাস্টমারের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে । এ গুরুদায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে বহু মাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী একজন যোগ্য নেতা মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন । যোগ্য নেতা হবেন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব । যাকে দেখে সবাই তাকে অনুকরন করবেন । আধুনিক ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করে, দলের নেতারা তাদের প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের ক্রিয়াকলাপগুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন করে, প্রতিটি দলের সদস্যদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা পেতে উৎসাহিত করতে পারেন।

একজন দলনেতাকে দলের উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে তাকে অবশ্যই একজন কার্যকরী নেতা হতে হবে। সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা অর্জনের জন্য নেতারা তাদের অধিনদের কর্মপ্রবাহকে যথাসম্ভব সুগম করার জন্যও দায়িত্বশীল। একজন দলনেতা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় জেনে এবং কৌশলগুলি ব্যবহার করে তিনি দক্ষতার উন্নয়ন করতে পারেন। ফল স্বরূপ ইহা পরিবর্তে তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার পথকে প্রশস্ত করবে।

সর্ব প্রথম জানতে হবে নেতা কে ? নেতা হল তিনি যে পরিচালনা ও আদেশ করে,

একটি দলকে
একটি সংগঠনকে
একটি সম্প্রদায়কে

প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নেতাকে একটি দলকে পরিচালনা করতে হয় । প্রতিষ্ঠানে একাধিক দল নেতা থাকতে পারেন । দল নেতারা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দায়বদ্ধ থাকেন । মনে রাখতে হবে কোন দিন কোন নেতা জন্মগ্রহণ করেনা কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের তৈরী করে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে।

সেই একজন সফল নেতা যিনি,

পথ সর্ম্পকে জানে
ঐ পথে যেতে পারে
পথ দেখাতে পারে

একজন নেতাকে দলের সদস্যগণকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে তাকে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তার সম্মুখ জ্ঞান থাকতে হবে । তবেই তার পক্ষে নির্ভুলভাবে কাজ সম্পাদন করে যোগ্যতার সাথে দল পরিচালনা করা সম্ভব হবে ।

Meaning of a LEADER

L- Learn (শেখা): নেতার মধ্যে সর্বদা জানার আগ্রহ থাকতে হবে । সদা পরিবর্তনশীল বিষয় সম্পর্কে জেনে তা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকতর উৎপাদনশীল করতে সচেষ্ট হতে হবে ।

E- Empower (ক্ষমতা প্রদান): নেতার অধিকতর দায়িত্ব গ্রহনের ক্ষমতা থাকতে হবে ।

A- Authentic (নির্ভরযোগ্য): নেতাকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হবে তার উপর যেন কর্তৃপক্ষ নির্ভর করতে পারে ।

D- Determination (সংকল্প): নেতাকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয় তা সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করার জন্য তার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে ।

E- Energy (কর্মশক্তি): নেতার সার্বক্ষনিকভাবে দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা থাকতে হবে ।

R- Responsible (দায়িত্ববান): নেতার অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে জবাবদিহিতা থাকতে হবে ।
প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে একজন ভাল নেতার প্রতিষ্ঠানের Vision, Mission & Goal সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা থাকতে হবে।

ভিশন (Vision): ভিশন হল সংস্থা "কী" অর্জন করতে চায়। ভিশন একটি প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে শেষ পর্যন্ত কী হতে চায় তার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে। এটি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, সাধারণত পাঁচ থেকে দশ বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য। উদহারণ হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত ভিশন হতে পারে ।
"বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদন করা" বিশ্বমানের পণ্য তৈরি করতে হলে আবশ্যই পণ্য তৈরীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে নির্ভুলভাবে স্বল্প সময়ে কম খরচে উৎপাদন করতে হবে । এক্ষেত্রে দল নেতাকে দলের প্রতিটি সদস্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করনের মাধ্যমে কাজ সমাধা করতে হবে ।

মিশন (Mission): মিশন হল প্রতিষ্ঠান ভিশন অর্জনের জন্য যা করে। ইহা বর্তমান সময়ের উপর ফোকাস করে ।
উদহারণ হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত মিশন হতে পারে ।
"ভোক্তাদের ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক এবং বিনোদনমূলক চাহিদা মিটাতে প্রতিযোগীতা মূলক মূল্যে সর্বোচ্চ গুনগত মান প্রদান করা" ভোক্তার সার্বিক চাহিদা পূরণ করতে হলে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের পণ্যের সমমানের বা অধিকমান সম্পন্ন পণ্য স্বল্প সময়ে কম খরচে উৎপাদন করতে হবে যা ব্যবহার করে ভোক্তা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন । ভোক্তার চাহিদা পূরণ করার জন্য দলনেতাকে মার্কেট সার্ভে করার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। একই সংগে তাকে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিটি ধাপে অপচয় ও নন ভ্যালু এডেড কার্যক্রম রোধকল্পে সকল সদস্যগনকে সচেতন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

লক্ষ্য (Goal): লক্ষ্য বর্ণনা করে যে একটি কোম্পানি কী অর্জন করতে চায় বা ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোথায় যেতে চায়।

উদাহরণ হিসাবে একটি প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত লক্ষ্য হতে পারে । "রাজস্ব বৃদ্ধি এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নেট আয়কে সর্বাধিক করা।"
প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রফিট মার্জিন বৃদ্ধি করা একান্ত জরুরী। মুনাফা ছাড়া যে কোন প্রতিষ্ঠানের কলেবর বৃদ্ধি এবং নিয়োজিত জনবলের অধিকতর কল্যাণ মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রেও দলনেতার ভূমিকা অনস্বীকার্য । একজন যোগ্য দলনেতার পক্ষে সম্ভব দলের সদস্যগণকে নিয়ে সম্ভাব্য এলাকায় খরচ কমানোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করা ।
উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দলনেতা কর্তৃক সম্পাদনকৃত কাজ সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য করনীয় এবং অকরনীয় কাজ সমূহের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে ।

দলনেতা কর্তৃক করণীয় কাজ সমূহ

-সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে কাজটি সম্পর্কে জানতে হবে ।
-নিজের সামর্থ্য এবং শক্তি সম্পর্কে ধারনা থাকতে হবে ।
-একটি টিমের দূর্বল দিক গুলো সম্পর্কে জানতে হবে ।
-দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা সমাধান করতে হবে ।
-পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে ।
-টিম পরিচালনায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে ।
-সমস্যা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে ।

একজন নেতার অকরণীয় কাজ সমূহ

-কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে নিজের আবেগের মূল্য দেওয়া যাবে না ।
-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা ।
-অন্যকে দোষারোপ করা যাবে না ।
-সমস্যাকে সমস্যা মনে করা যাবে না ।

টিম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না ।
পরিকল্পনা করার সময় সর্তক থাকতে হবে ।
নেতার মধ্যে বিরাজমান গুনাবলীর ভিত্তিতে দুই ধরনের নেতা হয়ে থাকে । এক ভাল নেতা অপরজন হচ্ছে অযোগ্য নেতা।

নিম্নে ভাল নেতা ও অযোগ্য নেতার গুনাবলী নিয়ে আলোচনা করা হল ।

ভাল নেতা

Democratic (গণতান্ত্রিক): নেতাকে দলের সকল সদস্যগন যেন সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
Serves others (সেবাদানকারী): নেতাকে দলের সদস্যগনকে সর্বদায় সহযোগিতার করার মনমানসিকতা থাকতে হবে ।
Supports (সমর্থন দানকারী): নেতাকে দলের সদস্যকেগনকে ভাল কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে ।
Courageous (সাহসী): নেতাকে দলের সদস্যগনকে নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে ।
Listens (শ্রোতা): নেতাকে সকলের কথা শোনার মনমানসিতা থাকতে হবে ।
Inspires (উৎসাহ প্রদানকরী): নেতাকে দলের সদস্যগনের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে ।
Humble (নম্র): নেতার মধ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সম্মান ও অধিনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্নেহ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে ।
Influences (প্রভাবশীল): নেতার মধ্যে দল পরিচালনার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সক্ষমতা থাকতে হবে যার ফলে দলের সদস্যগন যেন তার প্রতি অনুগত থাকে ।

অযোগ্য নেতা

Self serving (স্বার্থপর): নেতা সবসময় নিজের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করে। অন্যের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব প্রদান করে না ।
Discourages (নিরুৎসাহিতকারী): নেতা দলের সদস্যগনকে তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান না করে বরং নিরুৎসাহিত করে ।
Blames (অপবাদ দেওয়া): নেতা দলের সদস্যগনকে তাদের কাজের দোষ খুজেন ।
Weak (দুর্বল): নেতার জ্ঞানের পরিধি কম হওয়ায় দুর্বল চিত্তে হয়ে থাকেনন। যার দরুন নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য কিছু বুঝে অথবা না বুঝে নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যার ফলে দলের সদস্যগন কর্তৃক তার প্রতি মান্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
Arrogant (অহংকারী): নেতার মধ্যে আমিত্ব ভাব কাজ করে । যার দারুন কর্তৃপক্ষকে না মানার প্রবণতা তার মধ্যে কাজ করে ।
Commands (আদেশ): দলের নেতা সদস্যগনের কাজের সংগে সম্পৃক্ত না হয়ে সবসময় নির্দেশনা প্রদান করে ।
Authoritarian (স্বৈরাচারী): ভাল হোক মন্দ হোক নেতা যেটা বুঝেন সেটাই করার জন্য সদস্যগনকে নির্দেশনা প্রদান করেন
Oppresses (নিপীড়নকারী): নেতার মধ্যে সদস্যগনকে তাদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করার প্রবণতা কাজ করে । যার ফলে সদস্যগণ কাজে সর্বদায় নিরুৎসাহিতবোধ করে ।
নেতা (Leader) বনাম বস (Boss) বা ম্যানেজার (Manager) সবাই বস (Boss) বা ম্যানেজার (Manager) হতে পারেন । কিন্তু যথা যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানকারী বস (Boss) বা ম্যানেজার (Manager) হওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয় না । এর জন্য বস (Boss) বা ম্যানেজার (Manager) গণকে নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট গুনাবলী অর্জন করতে হয় । অর্জিত গুনাবলী অর্জন করার মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা আনায়ন পূর্বক কাজকে অধিকতর উৎপাদনশীল করে তোলা সম্ভব। নতুবা তিনি নেতৃত্ব প্রদান করার ক্ষেতে শুধু মাত্র বস (Boss) বা ম্যানেজার (Manager) হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন । আলোচনার সুবিধার্থে নেতা বনাম বস (Leader vs Boss) এবং নেতা বনাম ম্যানেজার (Leader vs Manager) এর পার্থক্য বুঝতে হবে ।

নেতা এমন ব্যক্তি যিনি তার অনুসারীদের আচরণকে নির্দেশনা, পরিচালনা এবং প্রভাবিত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে থাকেন । বস হল একজন তত্ত্বাবধায়ক ভূমিকায় থাকা ব্যক্তি যিনি একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। বসকে অবশ্যই কার্যকরভাবে কর্মীদের পরিচালনা, নেতৃত্ব এবং অনুপ্রাণিত করতে হবে। তিনি কর্মচারীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন বিভাগীয় ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পূর্ণ করেন এবং লক্ষ্য পূরণ নিশ্চিত করার জন্য দায়ী।

নেতা (Leader)	বস (Boss)
কাজের জন্য কর্মীদের শিক্ষা দেয়	কাজের জন্য কর্মীদের চাপ প্রদান করে
নিজের উপর নির্ভরশীল	কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভরশীল
ভয়কে জয় করে	ভয়কে উৎসাহিত করে
সবসময় বলে "আমরা"	সবসময় বলে "আমি"
নিজের ঘাড়ে দোষ নেয়	কর্মীদের দোষারোপ করে
টিমের সবাইকে বাহবা দেয়	নিজে বাহবা নেয়
কর্মীদের জিজ্ঞাসা করে ।	কর্মীদের হুকুম করে
সবসময় বলে "চল"	সবসময় বলে "যাও"

নেতা বনাম ম্যানেজার (Leader vs Manager)

নেতা এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার অনুসারীদের আচরণকে নির্দেশ, পরিচালনা এবং প্রভাবিত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে । ম্যানেজার হল সংস্থার একজন প্রতিনিধি যিনি কর্মচারীদের একটি গ্রুপের কাজ পরিচালনার জন্য দায়ী এবং যখনই প্রয়োজন হয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নেতা (Leader)	ম্যানেজার (Manager)
একজন নেতা প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত ও ভবিষ্যত লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন	ম্যানেজার বর্তমান দায়িত্ব, ভূমিকা এবং দায়িত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
একজন নেতা পরিবর্তনের প্রশংসা করেন	ম্যানেজার স্থিতিশীলতা পছন্দ করেন
নেতা নিজেকে দীর্ঘমেয়াদী দিকে পরিচালিত করেন	ম্যানেজার স্বল্পমেয়াদী দিকে পরিচালিত করেন
নেতা একটি দর্শনে নিযুক্ত হন	ম্যানেজার পদ্ধতিতে ফোকাস করেন
নেতা জানেন কীভাবে পরিচালনা করতে হয়	ম্যানেজার নিয়ন্ত্রণ করতে পছন্দ করেন
নেতা সংস্কারে বিশ্বাস করেন	ম্যানেজার যুক্তিবাদী মন ব্যবহার করে
নেতা সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেন	ম্যানেজার প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসার প্রসঙ্গে কাজ করে
নেতা বাস্তবতা অনুসন্ধান করে	ম্যানেজার বাস্তবতা গ্রহণ করে এবং
নেতা মানুষের উপর ফোকাস করেন	ম্যানেজার সিস্টেম এবং কাঠামোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

SMART কাজ

আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নেতা কর্তৃক সম্পাদিত কাজ অবশ্যই SMART হতে হবে। নতুবা তার দ্বারা সম্পাদিত কাজে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে না ।

SMART বলতে কাজ সমূহ হতে হবে:-

S : Specific (সুনির্দিষ্ট): কাজ শুরু আগে আমাকে জানতে হবে আমি কিসের মাধ্যমে কি করব । উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি পণ্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস করুন ।

M : Measurable (পরিমাপযোগ্য): যে কাজটি করা হবে তা যেন সংখ্যা, পরিমান অথবা মূল্যমানে পরিমাপ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে পণ্যের অপচয় তার পরিমাণ ২৫% থেকে ২০% হ্রাস করতে হবে ।

A : Achievable (অর্জনীয়): যে টার্গেট নেওয়া হবে তা যেন বাস্তব সম্মত হয় । কাল্পনিক কোন টার্গেট নেওয়া যাবে না। উদাহরণ হিসেবে কাল্পনিক টার্গেট হিসেবে বলতে পারি যে পণ্যের বর্তমান অপচয় তাৎক্ষণিকভাবে ২৫% থেকে ০% হ্রাস করুন।

R : Realistic (বাস্তবিক): যে কাজের সাথে সম্পর্কিত সে কাজ সম্পর্কিত টার্গেট হতে হবে । তা না হলে তা বাস্তব সম্মত হবে না । উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি কোন লোক মটর তৈরী করার কাজে নিয়োজিত । তিনি টার্গেট সেট করলেন জনসংখ্যা হ্রাস করবেন । এটা অবশ্যই বাস্তব সম্মত হবে না ।

T : Time bound (সময়াবদ্ধ): যে টার্গেট সেট করা হবে তা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হবে । অপচয় হ্রাস করার কাজটি আগামী ৪(চার)মাসের মধ্যে সম্পাদন করা হবে । যা কিনা সময়াবদ্ধ টার্গেট ।

নেতৃত্ব প্রদানঃ

একজন নেতাকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে নেতার মধ্যে এমন কিছু গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাতে হবে যার দরুণ সবাই তাকে মান্য করে চলেন । নেতৃত্ব এমন একটি সামর্থ যা অন্যদেরকে প্রভাবিত করে কোন প্রকার কর্তৃত্ব ছাড়া । নেতৃত্ব হলো এমন এমন একটি গুণ যা নতুন নেতা তৈরী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।

নিম্নলিখিত কাজ সমূহ সম্পন্ন করার জন্য নেতৃত্ব প্রয়োজন হয় ।

সঠিক পরিকল্পনা করা: যে কোন কাজের সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে শুরু হতে হবে সঠিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা না হলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না । পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে হবে কি কাজ করা হবে, কেন করা হবে, কিভাবে করা হবে, কাজের সাথে কারা সংশ্লিষ্ট থাকবে, কাজ সম্পন্ন করতে কি পরিমাণ আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকবে এবং কত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে ।

কর্মীদের উৎসাহ প্রদান করা: যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয় । এর জন্য নেতাকে সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে সদস্যগণকে কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে ।

মনোবল বৃদ্ধি করা: কর্মীদের মনোবল দুর্বল থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ তুলে আনা সম্ভব নয়। যথাযথ নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে । মনে রাখতে হবে কর্মীদের মাঝে কোনভাবে নেগেটিভ মনোভাব কাজ না করে । তাদের বুঝাতে হবে অন্যরা পারলে আমরাও পারব । এর জন্য সদস্যগণকে যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা তাকে প্রদান করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

কাজের স্বীকৃতি প্রদান: সদস্যগণের ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে। এর ফলে সদস্যগণ নেতার নেতৃত্ব মেনে কাজ করতে প্রস্তুত থাকবে ।

পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত প্রস্তুত পরিবর্তন করা: পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনেক সময় বাস্তবায়নের নিরিখে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয় । সেক্ষেত্রে নেতাকে তার নিজস্ব প্রজ্ঞার মাধ্যমে টীমের সদস্যগণের সাথে পরিকল্পনা করে পরিকল্পনার পরিবর্তন এনে টীমকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে ।

টিম পরিচালনা করা: নেতাকে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে মনে রাখতে হবে দলের সকল সদস্যগনের মনোভাব ও যোগ্যতার তারতম্য থাকে । নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য নেতাকে সদস্যগণের মনোভাব এর পরিবর্তন এনে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টীমকে কাজের উপযোগী করে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে ।

কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব করা: নিরপেক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মীদের বিষয় সমূহ ম্যানেজমেন্ট এর সম্মুখে তুলে ধরতে হবে । যার ফলে তারা যেন তাদের চাহিদার আশু সমাধান পান ।

সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া: সঠিক নির্দেশনা প্রদান নেতৃত্বের একটি অন্যতম দিক। সদস্যগণকে কখন কোন সময় কোন কাজটি কিভাবে করাতে হবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সেভাবে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে । যার ফলে কাজের কোন প্রকার ভুল ত্রুটি হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না ।

লক্ষ্য স্থির করা: কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি হবে তা স্থির করে দলকে সেভাবে নির্দেশনা প্রদান এবং পরিচালনা করতে হবে । অনেক সময় দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কাজকে সময়োপযোগী করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা পরিবর্তন এনে নতুন আংগিকে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় কাজ করার জন্য দলকে বুদ্ধিমত্তার সাথে সেভাবে তা করতে হবে ।

আন্ত বিভাগীয় সমন্বয় করা: সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে । এর জন্য প্রয়োজন হতে পারে এক পদ্ধতির সাথে অন্য পদ্ধতির, এক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির অথবা এক দলের সাথে অপর দলের সম্পৃক্ততা । সম্পৃক্ততার পরিবেশ সহজীকরণের মাধ্যমে

উৎপাদনশীল পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব । নেতার যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে এ ধরণের কর্মপরিবেশ তৈরী করা সম্ভব ।
নেতৃত্ব প্রদানের গুনাবলী অর্জনে করণীয় কার্যক্রম:

•Learn to think more critically (আরও সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে শিখতে হবে): প্রত্যকটি বিষয়ের ভাল এবং মন্দ উভয় দিক আছে । গৃহীত পরিকল্পনার মন্দ দিকের সমালোচনা পজিটিভভাবে নেওয়ার মনমানসিকতা নিয়ে যথার্থতা আনতে হবে । এর ফলে নেতার কাজে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার সম্ভবনা থাকবে না ।

•Do more to enthuse your team (আপনার দলকে উৎসাহিত করতে আরও কিছু করুন): সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য দলের সদস্যগণের কাজে প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী । কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য পুরস্কৃত করাসহ লক্ষ্য ভিত্তিক ইনসেনটিভ এর ব্যবস্হা করা যেতে পারে ।

•Make your goals and future vision attractive and attainable (আপনার লক্ষ্য এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আকর্ষনীয় এবং অর্জনযোগ্য করুন): নেতার নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমান এবং গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজের মধ্যে প্রোডাকটিভিটি টুল্স ব্যবহার করে পরিবর্তন আনতে হবে । কাজের ধারা পরিবর্তন করার মাধ্যমে কাজকে সহজীকরন করতে হবে। মনে রাখতে হবে পরিবর্তিত ধারায় কাজ করতে দলের সদস্যগণ যেন স্বাচ্ছন্দবোধ করেন একই সংগে অপচয়রোধ এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কম খরচে অধিক গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন হয় ।

•Learn to communicate clearly (স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করতে শিখুন): যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য যে কোন প্রকার তথ্য আদান প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার গ্যাপ থাকা চলবে না । বিশেষ করে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না । তথ্যের নির্ভুলতা এবং সঠিক সময়ে তথ্য আদান প্রদান করার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া খুবই জরুরী।

•Improve your speaking skills (আপনার কথা বলার দক্ষতা উন্নত করুন): নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য নেতার কথার স্পষ্টতা থাকতে হবে । কোন প্রকার জড়তা থাকলে সদস্যগণ তাকে মানবে না । একজন নেতার কথার মধ্যে জড়তা তখনই আসবে যখন তার কাজের জ্ঞানের স্বল্পতা থাকবে। দলকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট কাজের উপর দল নেতার ব্যাপক ধারণা রাখতে হবে ।

•Make sure work is done correctly and on time (কাজ সঠিকভাবে এবং সময়মতো সম্পন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত করুন): নেতার যে কোন প্রকার কাজের নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজটি সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ে শেষ করা । এক্ষেত্রে নেতা সংশ্লিষ্ট কাজ সঠিকভাবে শেষ করার জন্য PLAN-DO-CHECK-ACTION (PDCA) Circle এবং নির্দিষ্ট সময় কাজ করার জন্য Gantt Chart এর সাহায্য নিতে পারেন ।

•Find better ways to do things (জিনিসগুলি করার জন্য আরও ভাল উপায় খুঁজুন): যে কোন প্রকার কাজের নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য তাকে কাজটি প্রতিনিয়ত অধিক উৎপাদনশীভাবে সম্পন্ন করতে হবে । এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদনের এর পরিবর্তন আনায়ন করা। পরিবর্তন আনার জন্য সর্বাগ্রে প্রসেস এ ব্যবহৃত Man, Machine, Material and Method সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা করতে হবে ।

•Encourage progress and recognize efforts (অগ্রগতিকে উৎসাহিত করুন এবং প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিন): নেতার নেতৃত্ব দলের সদস্যগন স্বানন্দে তখনই গ্রহন করবে যখন তারা কাজ করতে উৎসাহবোধ করে এবং সম্পাদিত কাজের স্বীকৃতি পায় । উৎসাহ এবং কাজের স্বীকৃতি লিখিত এবং আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা যেতে পারে ।

•Build team spirit (দলগত মনোভাব তৈরি করুন): বর্তমান প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবসায় দলের সকল সদস্যগনের মনোভাব এক হওয়া জরুরী । দলের সকল সদস্যগনের মনোভাব এক করার জন্য দলের নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতাকে এর জন্য প্রতিনিয়ত ম্যান টু ম্যান বসে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে ।

সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের অভাব অভিযোগ না শুনে ব্যবস্থা নিলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা কিনা নিম্ন উৎপাদনশীতার কারণ হবে।

•Recognize success and learn from failure(সাফল্য চিনুন এবং ব্যর্থতা থেকে শিখুন): নেতাকে দলের নেতৃত্ব প্রদান করতে হলে কাজের কোনটা সাফল্যতা এবং কোনটা ব্যর্থতা তা তাকে জানতে হবে । সফলতা লাভ করা কাজটির স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করতে হবে । সম্পাদিত কাজের রি স্ট্যান্ডাড না আসা পর্যন্ত বর্তমান স্টান্ডাড অনুযায়ী কাজটি যেন সম্পাদন হয় তার প্রতি নেতার খেয়াল রাখতে হবে । অপর দিকে যে কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই তা কি কারনে সম্ভব হয় তা জানার জন্য Fish bone diagram or Brainstorming পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

•Trust your subordinates (আপনার অধীনস্থদের বিশ্বাস করুন): সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য অধীনস্থদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন না করতে পারলে অবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন হয়ে পরবে । নেতা যত আন্তরিক হয়ে তার সহযোগিতার হাত সদস্যদের প্রতি সম্প্রসারিত করবে তত বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি হবে । যা কিনা দলকে নেতৃত্ব দেওয়া ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন কররে। পরিশেষে বলা যায় "সে একজন নেতা যার সফল নেতৃত্বে অনেক নেতা তৈরী হয়" যার ফলে প্রতিষ্ঠানে সার্বিকভাবে উৎপাদনশীল কার্যক্রমের ব্যাপক গতিশীলতা লাভ করে ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা

আওলিয়া খানম
অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও

ভূমিকাঃ

সংক্ষেপে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হল উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং প্রযুক্তিতে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের প্রচলন। যার মধ্যে সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম (সিপিএস), আইওটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস, ক্লাউড কম্পিউটিং, কগনিটিভ কম্পিউটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগুলো অন্তর্ভুক্ত।
বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে শিল্পবিপ্লবের ফলে। বর্তমান বিশ্বও টিকে আছে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ওপর। এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মোট তিনটি শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। এ শিল্পবিপ্লবগুলো বদলে দিয়েছে সারা বিশ্বের গতিপথ, বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারা।

১৭৮৪ সালে পানি ও বাষ্পীয় ইঞ্জিনের নানামুখী ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল প্রথম শিল্পবিপ্লব। এতে এক ধাপে অনেকদূর এগিয়ে যায় বিশ্ব। এরপর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে একেবারেই পাল্টে যায় মানুষের জীবনের চিত্র। কায়িক পরিশ্রমের জায়গা দখল করে নেয় বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি।

শারীরিক শ্রমের দিন কমতে থাকে দ্রুততর গতিতে। এটিকে বলা হয় দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব। প্রথম শিল্পবিপ্লব থেকে দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের প্রভাব আরও বিস্তৃত। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের ঠিক ১০০ বছরের মাথায় ১৯৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয় ইন্টারনেট। শুরু হয় ইন্টারনেটভিত্তিক তৃতীয় শিল্পবিপ্লব।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হলে সারা বিশ্বের গতি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আসছে এ ভার্চুয়াল জগতেরই আরও বিস্তৃত পরিসর নিয়ে।

যেখানে মানুষের আয়ত্তে আসছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট, যা সম্পূর্ণ রূপেই মানবসম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে! এ নিয়েই এখন তোলপাড় চলছে সারা দুনিয়াজুড়ে।
প্রযুক্তিনির্ভর এ ডিজিটাল বিপ্লবকেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। বিশ্ব এখন জোর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে। বাংলাদেশও রয়েছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে।

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতা, বহুজাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ ও বিশ্লেষকরা ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব নিয়ে বহুমুখী আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

অবশ্যম্ভাবী এ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও কীভাবে কল্যাণমুখী করা যায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির চাকা আরও গতিশীল করার দিকে মনোনিবেশ করেছে।

দক্ষ মানবসম্পদঃ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আজ এক বাস্তবতা। এটি মোকাবেলায় জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। আর মানবসম্পদ তৈরি করতে প্রয়োজন শিক্ষা। এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণেই সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বৈশ্বিক

প্রতিযোগিতায় টিকতে উচ্চশিক্ষাকে নতুন করে সাজানোর কথা বলেছেন। তিনি যথার্থই দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনপূর্বক যথাযথ পরামর্শ দিয়েছেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী প্রত্যাশিত শিক্ষাক্রম কেমন হওয়া উচিত, তা অবশ্যই গুরত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে গুরত্ব দিতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন ও মৌলিক অর্জনের ওপর। লার্ন, আন-লার্ন ও রি-লার্ন পদ্ধতির বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

টি পি এম(টোটাল প্রোডাকটিভিটি স্মার্ট প্রোডাকটিভিটি বা মেইটেনেন্স বা সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা রক্ষনাবেক্ষনঃ

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে শিল্পোন্নত জাপানের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা রক্ষনাবেক্ষণ (টিপিএম) কৌশল অনুসরণের বিকল্প নেই। টিপিএম এর মাধ্যমে বা এর যথাযথ প্রয়োগে শিল্প কারখানায় স্মার্ট প্রোডাকটিভিটি বাড়াতে সক্ষম ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন একদল বিজ্ঞানী, যারা জার্মান সরকারের জন্য একটি উচ্চ প্রযুক্তিগত কৌশল তৈরি করছিলেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের নির্বাহী চেয়ারম্যান মি. ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শব্দটিকে বৃহৎ পরিসরে উপস্থাপন করেন। শোয়াব তখন এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বায়োলজি (সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস)কে একত্রিত করে পৃথিবীকে উন্নতির পথে আরও গতিশীল করা যায়। শোয়াব আশা করেন, এ যুগটি রোবোটিক্স বুদ্ধিমত্তা, ন্যানোটেকনোলজি, কোয়ান্টামকম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অফ থিংস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস, ভিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং এবং সম্পূর্ণ স্বশাসিত যানবাহনের ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তির যুগান্তকারী যুগ হিসাবে চিহ্নিত হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ওই প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের কৌশলগত টেকসই সমাধান হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি,
ক্ষুধা মুক্ত দেশ গড়ি

অপচয় রোধের মাধ্যেম উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন

এ টি এম মোজাম্মেল হক
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ)
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

অপচয় (Waste) বলতে কি বুঝায় ?
অপচয় হলো যে কাজ কোন প্রকার মূল্য সংযোজন করতে পারে না তাহাই হচ্ছে অপচয়। উৎপাদন বা সেবা কার্যে যে সকল অপচয় গুলি পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে সময়ের অপচয়, সম্পদ ও কাঁচামালের অপচয়, প্রচেষ্টার অপচয়, অর্থের অপচয়, কাজের অপচয় ইত্যাদি ।

সময়ের অপচয় চিন্তা করুন অতীতে আমরা যে সময় নষ্ট করেছি তা যদি একত্র করা হয় তাহলে কত দিন, কত মাস, কত বছর হবে তা নিজেকে প্রশ্ন করুন । জাপানীরা কোন কাজ হাতে নিলে তারা প্রথমে কত সময়ে কাজটি শেষ করা যাবে তার জন্য একটি সময় নির্ধারন করে । সেই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য চেষ্টা করে । অর্থাৎ তারা সময়ে মূল্যকে অনেক গুরুত্ব দেয়, ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বেশী । আমরা কোন কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করি না। অযথা সময় নষ্ট করি, সময়মত কাজ শেষ করতে না পারার ফলে আমাদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। আমরা কর্মস্থলে সময়মত পৌঁছার জন্য হাতে সময় নিয়ে বাসা থেকে বের হইনা, ফলে কর্মস্থলে বিলম্বে পৌঁছার জন্য নানা অজুহাত বা যানজটকে দায়ী করি । একজন কর্মী কর্মস্থলে বিলম্বে পৌঁছার জন্য অন্য সহকর্মীর কাজের ব্যাঘাত ঘটে বা উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত কর্মী সঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে পারে না, তাতে কাস্টমার তার সময়মত সেবা হতে বঞ্চিত হয় বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় না। আমরা এখন থেকে আর সময় নষ্ট না করে সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করবো, তাতে ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ।

সম্পদ ও কাঁচামালের অপচয় চিন্তা করুন অতীতে আমরা যে যে সম্পদ বা কাঁচামাল নষ্ট করেছি তা একত্র করা হলে টাকার পরিমান কত হবে । অনেক সময় দেখা যায় একজন দর্জি ২ মিটার দিয়ে একটি জামা তৈরী করে আবার আর একজন দেড় মিটার দিয়ে জামা তৈরী করে । সম্পদ বা কাঁচামাল আমরা কিভাবে নষ্ট করি তার একটি উদাহরনে মাধ্যমে তুলে ধরছি আমি একটি সু কারখানায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য গিয়েছিলাম । সে কারখানা ম্যানেজার আমাকে তাদের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে জন্য নিয়ে যায়। পরির্দশনে আমি সেখানে দেখতে পাই মেয়ে শ্রমিকরা সোলের তলায় গাম দিয়ে সোল লাগাচ্ছে, কিন্তু গামের পরিমান যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী ব্যবহার করছে, ফলে অনেক পরিমান গাম মেঝেতে পড়ে যাচ্ছে । মনে করেন, যদি একটি জুতার তলার সোল লাগাতে ২৫ গ্রাম গামের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে কম পক্ষে ১০ গ্রাম মেঝেতে ফেলে দেয়, এভাবে ১০০০ জুতার জন্য ১০ গ্রাম করে ১০০০০ গ্রাম গাম অর্থাৎ ৪০০ জুতার গাম নষ্ট হয় । যে প্রতিষ্ঠানে আমরা কাজ করছি যদি এভাবে অল্প অল্প করে সম্পদ বা কাঁচামাল নষ্ট করি তা হলে সে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে ।

প্রচেষ্টার অপচয় চিন্তা করুন অতীতে আমাদের যতটা প্রচেষ্টার নষ্ট হয়েছে তা একত্র করা হলে প্রচেষ্টার সংখ্যা কত হবে । অনেক সময় দেখা যায় প্রতিষ্ঠানে নতুন শ্রমিক বা কর্মী নিয়োগ করার ফলে সে লোকটি তার সঠিক কাজটি করতে পারে না। নতুন শ্রমিক বা কর্মী বলে লজ্জায় কারো সাথে বলতেও পারে না, শুধু কাজটি করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, এভাবে অনেক সময় নষ্ট হয় । প্রতিষ্ঠানে যারা এইচআর এর দায়িত্বে রয়েছে তাদের কর্তব্য নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রমিক বা কর্মীকে সংশ্লিষ্ট কাজে ভালো ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে অভিজ্ঞ সহকর্মীর সাথে কাজে লাগাতে হবে ।

অর্থের অপচয় চিন্তা করুন অতীতে আমরা কত অর্থ অপচয় করেছি তা একত্র করা হলে সে অর্থের পরিমান কত হত ? আমরা নানা ভাবে অর্থের অপচয় করে থাকি । একজন চাকুরীজীবী বা শ্রমিকের চিন্তা করা উচিৎ আমাকে প্রতিষ্ঠান হতে পারিশ্রমিক হিসেবে যে বেতন বা মজুরী প্রদান করা হয় তার সীমার মধ্যে হতে মাস চলতে হবে । কিন্তু অনেকেই অর্থের অপচয় করে মাস শেষে হয় কোন দোকান হতে বাকী বাজার করে অথবা কোন বন্ধু বা সহকর্মীর নিকট হতে ধার করে । এ সমস্ত ধার কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সাধারনত বেশী হয়ে থাকে । প্রত্যেক শ্রমিক বা কর্মীর উচিৎ তার মাসিক বেতন-মজুরীর অর্থের পরিমানে একটি মাস কিভাবে চলবে তার একটি বাজেট তৈরী করা। কোন অবস্থায় মাসিকবেতন মজুরীর অর্থ মাসের ব্যয় বেশী হবে না।

প্রয়োজনে কিছু অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বিপদের সময় কাজে লাগে । কাজের অপচয় চিন্তা করুন অতীতে আমরা কাজ না করে কত সময় নষ্ট করেছি তা একত্র করা হলে সেকেন্ড থেকে শুরু করে কত বৎসর হত । আমরা কর্মস্থলে সময়মত হাজির হলেও আমাদের মাঝে কাজের ফাঁকিটা বেশী হয় । যেমন- অফিসে এসে এক কাপ চা পান করা, পেপার পাঠ করা, অযথা টেলিফোনে গল্পগুজব করা, কিছু সময় কাজ করার পর কোন সহকর্মীকে নিয়ে বাহিরে চা-নাস্তা খাওয়া, নামাজের সময় হলে আধা ঘন্টা পূর্বে নামাজের জন্য বাহিরে যাওয়া, লাঞ্চ করার অজুহাতে আধা ঘন্টা পর কাজ শুরু করা, নিজের কাজ না থাকায় অন্য সহকর্মীর টেবিলে সামনে বসে গল্প-গুজব করা ইত্যাদির কাজে অযথা সময় নষ্ট করে এভাবে কাজের অপচয় করা হয় । ফলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ।
সর্ব প্রথম আমাদের বুঝতে হবে কোনটি অপচয় এবং কোনটি অপচয় নয় তদানুযায়ী অপচয় রোধের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ।

উৎপাদন ও সেবা কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে ৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্ত করা হয় । যথা- অপারেশন, ট্রান্সপ্রোটেশন, স্টোরেজ, ইন্সপেকশন ও ডিলে । উৎপাদন কার্যে এই ৫টি কার্যক্রমের ফলে অপচয় হয়ে থাকে । উৎপাদন বা সেবা কার্যে এই ৫টি কার্যক্রমকে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা সম্ভব ।

অপচয় ও মূল্য বলতে কি বুঝায় ?
একটি উপযুক্ত সময়ে একজন কাস্টমার তার চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করার যে ক্ষমতা রাখে তাহাই মূল্য । একজন উৎপাদক গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করে । কাস্টমার যে পণ্যের মূল্য দিতে রাজী হয় না তাহাই অপচয় (Waste) ।
মূল্য সংযোজন (Value Added) বলতে কি বুঝায় ?
যে কার্যক্রম ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের আকৃতি/প্রকৃতি ও গুনাগুন পরিবর্তন করে তাকে মূল্য সংযোজন বলা হয় । মূল্য সংযোজন হল উৎপাদন বা সেবার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সৃষ্টি করাকে বুঝায় অর্থাৎ বিক্রিত দ্রব্য বা সেবার বিক্রয় লব্ধ অর্থ হতে ঐ দ্রব্য এবং সেবার ক্রয় মূল্য বিয়োগ করলে যাহা থাকে তাহাই মূল্য সংযোজন। শিল্প বা সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মীর শ্রম এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিনিয়োগকারীর যৌথ প্রচেষ্টার ফলই হচ্ছে মূল্য সংযোজন । মূল্য সংযোজনের এক অংশ মুজরী বা বেতন, সুদ, কর, অবচয় ও লভ্যাংশ হিসেবে বন্টিত হয় এবং অপর অংশ সঞ্চিত থাকে যা নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কাজে বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয় । যে কার্যক্রম ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের আকৃতি/প্রকৃতি ও গুনাগুন পরিবর্তন করে না তাকে মূল্য সংযোজন বলা যায় না ।

জাপানের টোয়েটা কোম্পানীর প্রতিদিন মিনিটে মিনিটে এত পরিমান গাড়ী উৎপাদিত হয় যা বলার অপেক্ষা রাখেনা, তারপরও তারা মনে করে কোম্পানী ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে । কোম্পানী তাদের জরিপের মাধ্যমে টোয়েটা প্রোডাকশন সিসটেম (TPS) এর আওতায় ৭(সাত) ধরনের অপচয় চিহ্নিত করে। যথাঃ- ১। অতিরিক্ত উৎপাদন (Over production), ২। অপ্রয়োজনীয় মজুদ (Unnecessary Inventory), ৩। অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ (Unnecessary Processing), ৪। পরিবহন (Transportation), ৫। অপেক্ষা করা বা বিলম্ব করা (Waiting or delay), ৬। অপ্রয়োজনীয় চলাচল বা অংগভংগি (Motion) ও ৭। ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন (Defect products)

১। অতিরিক্ত উৎপাদন (Over Production) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য তৈরী করা হচ্ছে অতিরিক্ত উৎপাদন । প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন একটি বড় ধরনের অপচয় । অতিরিক্ত উৎপাদন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য খারাপতম দিক । অনেক সময় কোন কোন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে দেখা যায় বাইয়ার কতগুলো সুন্দর সুন্দর পোষাক বা জামা-কাপড়ের আদেশ দিয়েছে । আদেশ অনুযায়ী সেই বাইয়ারের পণ্য তৈরী করে ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে । এমন সময় মালিক যদি মনে করে পোষাকগুলি ডিজাইন খুব সুন্দর বর্তমানে শ্রমিকদের কাজের এত চাপ বেশী নেই তাই একই ধরনের ডিজাইনের পোষাক বেশী করে তৈয়ার করে রাখি সময়মত অন্য বাইয়ারের নিকট বিক্রয় করা যাবে । সে ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্য বাইয়ারের এ ডিজাইন পছন্দ হচ্ছে না । সে অন্য ডিজাইনের পোষাকের আদেশ দিচ্ছে যার ফলে যে ধরনের সমস্যা তৈরী হয় তা হলো-
(ক) জায়গা দখল করে - একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য রাখার জন্য স্টোর রুম বা গুদাম ঘর থাকে তার অতিরিক্ত উৎপাদন করলে সে ব্যবস্থা থাকে না, ফলে অতিরিক্ত পণ্যের জন্য স্টোর রুম বা গুদাম ঘর ভাড়া করতে হয় । ফলে অতিরিক্ত স্টোরেজ খরচ বৃদ্ধি পায় । অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত তালিকা (ইনভেনটরী) করতে হয় । অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় ইহাতে ব্যবসায়ের চলতি মূলধনের অর্থের প্রতিবন্ধকতা (Money Block) সৃষ্টি হয় । যার ফলে ব্যাংক হতে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, ফলে ব্যাংকে অর্থের জন্য অতিরিক্ত সুদ প্রদান করতে হয় এর জন্য অতিরিক্ত অভারহেড খরচ বৃদ্ধি পায় ।

(খ) ক্রেতার চাহিদার পূর্বে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করা প্রতিষ্ঠানের জন্য অপচয় । উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমরা যখন প্রথমে মোবাইল সেট দেখেছিলাম তা কেমন ছিল আমরা সবাই জানি । এখন মোবাইল সেট কেমন তাও আমরা জানি । যদি মোবাইল কোম্পানী এখন যে মোবাইল গ্রাহকের হাতে রয়েছে সেটা যদি বেশী করে উৎপাদন করে তা ভবিষ্যতে গ্রাহকের জন্য সেটা চালু নাও থাকতে পারে, আবার ডিজাইন এবং রুচির পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন বড় ধরনের অপচয় হয় । পূর্বে আমারা কেমন জামা-কাপড় বা পোষাক পড়েছি, এখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা কেমন জামা-কাপড় বা পোষাক পড়ে, সে বিবেচনায় ডিজাইন এবং রুচির কথা চিন্তা না করে পণ্য উৎপাদন করলে বাজারে এর চাহিদা থাকবে না ফলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হবে ।

২। অপ্রয়োজনীয় মজুদ (Unnecessary Inventory) অপ্রয়োজনীয় মজুদ বা অতিরিক্ত মজুদ ক্রেতার চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত নয় । অতিরিক্ত মজুদ অপচয়ের আর একটি খারাপতম দিক । ইহার ফলে যে ধরনের সমস্যা তৈরী হয় তা হলো অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয়, কেননা কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবসার কাজে তার যেটুকু জায়গার প্রয়োজন সেটুকু নিয়ে সে ব্যবসা করে। অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না থাকায় ব্যবসায়ীকে অন্যত্র জায়গা ভাড়া করতে হয়, ফলে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়, অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় বা পরিবহন খরচ মিটানোর জন্য চলতি মুলধন সংগ্রহ করতে হয়, তার জন্য অতিরিক্ত ব্যাংক সুদ ও অভাহেড খরচ বৃদ্ধি পায় ।

অনেক সময় ব্যবসায়ী তার নিজেস্ব স্টোর বা গোডাউনে গাদাগাদি করে পণ্য সংরক্ষন করে থাকে, ফলে অনেক পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ইহাতে পণ্যের ত্রুটি বৃদ্ধি পায় ।

৩। অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ (Unnecessary Processing) অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করতে হয়, যার ফলে যে সমস্ত সমস্যা তৈরী হয় তা হলো- অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়, ফলে সময়ের অপচয় হয়, ইহাতে অতিরিক্ত খরচ ও ওভারহেড ব্যয় বৃদ্ধি পায় । চলমান বা কার্যকর উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে না । উৎপাদন পরিকল্পনায় কাস্টমার কর্তৃক কোন পণ্যের আদেশ না থাকায় অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনে কর্মীকে নিয়োজিত রাখতে হয় । আবার কাস্টমার কর্তৃক নতুন পণ্য তৈরীর আদেশ আসায় সে ক্ষেত্রে উৎপাদন পরিকল্পনায় কোন নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় না । ইহাতে ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন ও অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সময়ের অপচয় ও অভারহেড খরচ বৃদ্ধি পায়।

৪। পরিবহন (Transportation) বাজারের সাথে পণ্যের চাহিদা বিবেচনা না নিয়ে অপ্রয়োজনীয় উৎপাদনের ফলে পণ্য স্থানান্তরের জন্য অতিরিক্ত পরিবহন করতে হয় । কেননা পণ্য সংরক্ষনের জন্য প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত জায়গা না থাকায় উৎপাদিত পণ্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিবহন করতে হয় । ফলে প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত সমস্যা তৈরী হয় তা হলো-অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তরের জন্য পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, নিজেস্ব পরিবহন না থাকায় অন্য পরিবহন ভাড়া করতে হয় । অন্য পরিবহনে উৎপাদিত পণ্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরের জন্য অনেক পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে । অন্য স্থানে পণ্য সংরক্ষন করার জন্য অভারহেড খরচ বৃদ্ধি পায় বা প্রয়োজনীয় পণ্য খুজে পাওয়া যায় না এমনকি নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে, অনেক সময় পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়, ফলে ত্রুটি লুকায়িত থাকে ।

৫। অপেক্ষা করা বা বিলম্ব করা (Waiting or delay) প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কাজে বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অপেক্ষা একটি বড় ধরনের অপচয় । এক প্রসেস হতে অপর প্রসেসে যেতে সময় ক্ষেপণ করা হলো অপেক্ষা বা বিলম্ব । অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা বা বিলম্ব করার ফলে যে সমস্ত সমস্যা দেখা যায় তাহলো উৎপাদন হ্রাস । কারন হিসেবে বলা যায় আমরা অনেকেই জানিনা কাস্টমার কত প্রকার, অনেকে মনে করে কাস্টমার দুই প্রকার, দুই প্রকার কাস্টমারকে তারা নগদ কাস্টমার ও বাকি কাস্টমার, আবার খুচরা কাস্টমার ও পাইকারী কাস্টমার, দেশী কাস্টমার ও বিদেশী কাস্টমার হিসেবেও আক্ষায়িত করে । কাস্টমার দুই প্রকার বটে- অভ্যন্তরীণ কাস্টমার ও বর্হিগমন কাস্টমার । অভ্যন্তরীণ কাস্টমার হলো নিজেদের মধ্যে কাজ করাকে বুঝায় এবং বর্হিগমন কাস্টমার হলো আপনার পণ্য যারা ক্রয় করে বা সেবা গ্রহণ করে । প্রোডাকশন প্রসেস বা সেবা কার্যক্রম যদি কয়েকটি ধাপে বাস্তবায়ন করা হয় তবে এক ধাপ হতে অন্য ধাপে যেতে সময়ক্ষেপন করা হলো অপেক্ষা বা বিলম্ব । সময়মত উৎপাদন বা সেবা কার্যক্রম শুরু না করা হলে বিলম্বের জন্য উৎপাদন হ্রাস পায় বা সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, ফলে শ্রমিক বা কর্মীর অলস অবস্থান বিরাজ করার কারণে অভ্যন্তরীণ কাস্টমারের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় বা সময়মত পণ্য ডেলিভারী না পাওয়ায় বহিরাগত কাস্টমার হ্রাস পায় । সময়ের অপচয় হওয়ায় অভ্যন্তরীণ কাস্টমার অতি তাড়াতাড়ি উৎপাদন বা সেবা কার্যক্রম করার ফলে মূল্য সংযোজন বিহীন পণ্য তৈরী হয় বা সেবা কার্যক্রম ত্রুটিপূর্ণ হয় ও অভারহেড খরচ বৃদ্ধি পায় ।

৬। অপ্রয়োজনীয় চলাচল বা অংগভংগি (Motion) উৎপাদন বা সেবা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় চলাচলের জন্য উৎপাদন ও সেবার মান হ্রাস পায়, ফলে উৎপাদন কাজে পণ্যের একক মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ হয় । উৎপাদন বা সেবা কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় চলাচলের ফলে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হলো শ্রমিক বা কর্মীর কাজে মনোযোগ থাকে না । কারন হিসেবে দেখা যায় প্রোডাকশন এরিয়ায় যদি কোন কর্মী অপ্রয়োজনীয় চলাচল করে তখন

শ্রমিক বা কর্মী কাজে মনোযোগ না দিয়ে এদিক সেদিন তাকাতে থাকে তাতে ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেবার মান হ্রাস পায় । উদাহরণ হিসেবে আরও বলা যায় কাজের সময় যদি কারো মোবাইল ফোন বেজে উঠে তখন শ্রমিক বা কর্মীর মনোযোগটা সেই দিকে থাকে ফলে সময়মত কাজটি না করার জন্য শ্রমিক বা কর্মীর অতিরিক্ত সময় পরিশ্রম করতে হয় । কাজটি যথাসময়ে শেষ করে পরবর্তী ধাপে না দেওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ কাস্টমারের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় । এতে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যহত হয় ফলে বর্হিগমন কাস্টমার হ্রাস পায় ।

৭। ত্রুটিপূর্ণ বা নিম্নমান উৎপাদন (Defect products) ত্রুটিপূর্ণ বা নিম্নমানের উৎপাদন বা সেবা প্রদান কাস্টমারের চাহিদা পূরণে সক্ষম নয় । নিম্নমানের উৎপাদনের ফলে প্রতিষ্ঠানের একক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি বা নিম্নমানের সেবার জন্য কাস্টমারের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায় । যার ফলে প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত ক্ষতি বা অপচয় হয় তা হলো মূল্য সংযোজন বিহীন উৎপাদন বা সেবার মান হ্রাস পায় এবং অতিরিক্ত ব্যয় ও অভারহেড খরচ বৃদ্ধি পায় । কোন কোন উৎপাদিত পণ্যের এক্সট্রা রি-ওয়ার্ক করতে হয় বা কোন কোন পণ্যের এক্সট্রা রি-ওয়ার্ক করা যায় না । যেমন- প্লাষ্টিক পণ্য বা জামা-কাপড় এক্সট্রা রি-ওয়ার্ক করা যায় তাতে অতিরিক্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পায় । আবার সিরামিক বা কাঁচ জাতীয় পণ্যের উৎপাদন এক্সট্রা রি-ওয়ার্ক করার সুযোগ নেই, ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পায় । ত্রুটিপূর্ণ বা নিম্নমানের উৎপাদনের ফলে উক্ত পণ্য সংরক্ষন করার জন্য অতিরিক্ত জায়গার ব্যবস্থা করতে হয় । আবার ত্রুটিপূর্ণ বা নিম্নমানের উৎপাদনের ফলে অভ্যন্তরীণ কাস্টমারের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি ও বহিরাগত কাস্টমার হ্রাস পায় । আমাদের দেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে বর্হিগমন বা বৈদেশিক কাস্টমারগণ তাদের রুচি ও ডিজাইন অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ বা পণ্য তৈরীর আদেশ প্রদান করে । সে আদেশে পণ্যের ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমানের উৎপাদন দেখা গেলে এবং রুচি সম্মত ও ডিজাইন অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ বা পণ্য তৈরী করা না হলে বর্হিগমন বা বৈদেশিক কাস্টমারগণ পণ্যের ডেলিভারী নিতে রাজী হয় না । ফলে ত্রুটিপূর্ণ বা নিম্নমানের উৎপাদিত পণ্য গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী কম মূল্যে বাহিরে অন্য কাস্টমারের নিকট বিক্রয় করে দেয় । যার ফলে আমাদের দেশে লোকজন ফুটপাত বা গুলিস্তান মার্কেট হতে কম মূল্যে জামা কাপড় বা পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয় করতে পারে ।

অপচয় রোধের জন্য করণীয়ঃ

১। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উৎপাদন করবো- অর্থাৎ বাজারে কি পরিমান পণ্যের চাহিদা রয়েছে, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে হবে ।

২। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মজুদ করবো- অর্থাৎ বাজারে কি পরিমান পণ্য ভোক্তাদের মধ্যে সরবরাহ করা যাবে সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পণ্য মজুদ করতে হবে ।

৩। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পরিবহন করবো- অর্থাৎ পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য পরিবহণ করতে হবে ।

৪। স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণের কাজ করবো- অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বা বর্হিগমন বাজারে পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী নতুন পণ্য উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে হবে।

৫। উৎপাদন কাজে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা কর্মীকে পরিকল্পনা মাফিক অপেক্ষা করতে হবে ।

৬। প্রয়োজন ছাড়া উৎপাদন কাজে নিয়োজিত স্থানে অপ্রয়োজনীয় চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা মোবাইল সাউন্ডলেস রাখতে হবে । আবার সেবামূলক কাজে নিয়োজিত কর্মীর টেবিলের সামনে বসে অযথা গল্পগুজব হতে বিরত থাকতে হবে ।

৭। সবসময় গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদান করতে জনবলকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে, যাতে নিম্নমানের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং গুণগতমান সম্পন্ন সেবার মান বৃদ্ধি পায় ।

৭ (সাত) ধরনের অপচয় রোধে আরও করণীয়ঃ

১। যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া এবং সময়মত উৎপাদন শুরু করা- আমরা কর্মস্থলে সময়মত পৌঁছার জন্য হাতে সময় নিয়ে বাসা থেকে বের হয়নি, ফলে কর্মস্থলে বিলম্বে পৌঁছার জন্য নানা অজুহাত বা যানজটকে দায়ী করি । একজন কর্মী কর্মস্থলে বিলম্বে পৌঁছার জন্য অন্য সহকর্মীর কাজের ব্যাঘাত ঘটে বা উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত কর্মী সঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে পারে না, তাতে কাস্টমার তার সময়মত সেবা হতে বঞ্চিত হয় বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় না। আমরা এখন থেকে যথাসময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হবো এবং সময়মত উৎপাদন কাজ শুরু করবো ও সেবা কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করবো তাতে ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে ।

২। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লে-আউট পূনর্বিন্যাস ও ঢেলে সাজানো যাতে মালামাল স্বল্প পরিসরে বহন করা যায় এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রত্যাশীদের সেবা প্রদান করা যায় । আমরা অনেক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে যেয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকি । আমি একটি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে দেখতে পাই কাটিং সেকশন ৪র্থ তলায় এবং অপারেট যেখান থেকে সেলাই শুরু করে সে সেকশন নীচ তলায় । শ্রমিক কাঁচামাল বা কাপড় মাথায় করে ৪র্থ তলায় নিয়ে যায়, আবার কাটিং মাস্টার কাপড় কেটে শ্রমিককে দিয়ে অপারেটর সেকশনের নীচ তলায় পাঠায় । এতে সময়ও ব্যয় হয় আবার অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয় । কারখানা লে-আউট হতে হবে একের অন্যের কাছাকাছি । সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেও দেখা যায় যে রুম থেকে ফাইলের কার্যক্রম শুরু হয়, সে স্থান হতে ফাইল অনুমোদন কর্তৃপক্ষের রুম অনেক দূরত্বে অবস্থিত । সুতরাং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে একের অন্যের কাছাকাছি কার্যক্রম থাকতে হবে ।

৩। সম্পদের সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চত করার লক্ষ্যে উৎপাদন ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় জড়িত শ্রমিক ও কর্মীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে । বিশেষ করে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এইচআরডি এর কর্মকর্তাদের মনোযোগ দিতে হবে ।

৪। যখন যা প্রয়োজন শুধুমাত্র ততটুকু কাঁচামাল ক্রয় করা- উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য দেখা যায় কাঁচামালের সরবরাহ কমে যেতে পারে বা মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে সেজন্য অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমান কাঁচামাল মজুদ করে রাখে এটা ঠিক নয় । অনেক সময় খাদ্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠনে কাঁচামাল হিসেবে আলু-পিয়াজ মজুদ করে রাখে, তাতে দেখা যায় কাঁচামাল পঁচে গেছে অথবা মূল্য হ্রাস পেয়েছে, ফলে প্রতিষ্ঠানে লাভে চেয়ে ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পায়, সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ক্রয় বা মজুদ করা সমীচীন নয় ।

৭। যত কম সংখ্যক নিম্নমানের বা ত্রুটিপূর্ণ দ্রব্য উৎপাদন করা ও চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমান পণ্য বিক্রি করা যায় শুধামাত্র তা উৎপাদন করতে হবে ।

৮। যথোপযুক্তভাবে গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য তৈয়ারী ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৯। সমগ্র উৎপাদন রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে । এবং

১০। সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে দ্রব্য ও সেবাদি প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

উপসংহারঃ

সর্বদা অফিস সময়ে অফিস ত্যাগ করুন । কাজ হলো এমন একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া যা কখনই শেষ করা যায় না । কাস্টমারের স্বার্থ দেখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ পরিবারকে সময় দেয়া । বিপদে পড়লে আপনার বস বা ক্রেতা কেউ-ই সাহায্যের হাত বাড়াবে না, আপনার পরিবার ও বন্ধুরাই আপনার জন্য এগিয়ে আসবে । জীবনটা শুধু কাজ, অফিস আর ক্রেতা নিয়েই নয় । জীবন আরও অনেক মূল্যবান কিছুর সমষ্টি, সামাজিকতা, আরাম আয়েস ও ব্যায়ামের জন্য আপনার সময় বের করা জরুরী, জীবনকে অর্থহীন করবেন না । যে ব্যক্তি অফিস সময়ের পরও দীর্ঘক্ষন অফিসে কাজ করে সে আসলে পরিশ্রমী নয় । আসলে এতটাই বোকা যে সে নির্ধারিত সময়ে কাজ গুছিয়ে উঠতে পারে না । সে জীবন থেকে কিছু অর্জন করতে পারে না কারন তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন বলতে কিছুই নেই । সে তার কাজে অদক্ষ ও অকর্মণ্য । জীবনে সংগ্রাম ও কষ্ট করে লেখাপড়া করেছেন কি নিজেকে মেশিনে পরিণত করার জন্য ? যদি আপনার বস আপনাকে বাধ্য করে অফিস থেকে দেরী করে ফিরতে তবে বুঝতে হবে তিনিও অদক্ষ আর তার জীবনটাও অর্থহীন, সুতরাং এই লেখাটি তাকে দেখান । যথা সময়ে অফিস থেকে বের হওয়ার অর্থ দক্ষ, সুন্দর সামাজিক জীবন ও উন্নত পারিবারিক জীবন । দেরী করে অফিস থেকে বের হওয়ার অর্থঃ অদক্ষ ও অকর্মণ্য, কোন সামাজিক জীবন নেই ও কোন পারিবারিক জীবন নেই । আপনার কাজকে ভালোবাসুন তবে কোম্পানীকে নয়, কেননা আপনি জানেন না ঠিক কখন কোম্পানীটি আপনাকে আর ভালোবাসবে না । সূত্রঃ ড. এ. পি. জে. আব্দুল কালাম ।

উপসংহারের আলোকে আলোকপাত করছি- যে কর্মী যথা সময়ে অফিসে যায় ও সময়মত কাজ শুরু করে এবং কাজ শেষে সময়মত অফিস ত্যাগ করে তার উৎপাদনশীলতা বেশী ও পারিবারিক জীবন খুবই সুন্দর । যে কর্মী এক-দুই ঘন্টা বিলম্বে অফিসে যায় সে কাজও শুরু করে বিলম্বে, ফলে অফিসের কাজ সময়মত শেষ করতে না পারার জন্য তাকে অফিস সময়ের পরও কাজ করতে হয় । অফিস সময়ের পর কাজ করার জন্য তার সহকর্মীকে কাজের সহযোগিতার জন্য কাছে পায়না, ফলে একা একা কাজ করার জন্য কাজের ভুলত্রুটি হয়। যার ফলে তার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং বিলম্বে অফিস ত্যাগ করার জন্য পারিবারিক জীবন খুব বেশী সুন্দর হয় না । আসুন আমরা অপচয় রোধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, তবেই আমাদের দেশ অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করতে পারবে।

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগিতায়-উৎপাদনশীলতার শীর্ষের দিকে বাংলাদেশ।

আবু তৈয়ব
লেখক -প্রাবন্ধিক ও সমাজচিন্তক
অধ্যক্ষ, খলিলুর রহমান মহিলা (ডিগ্রি) কলেজ,
পটিয়া পৌরসভা,চট্টগ্রাম। ০১৭৪৫-৮৩২৭১১

সমাজ ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি হল উৎপাদন গতি। এই উৎপাদন ও তার ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে। যে জাতি জ্ঞান আর দক্ষতা সূচকে এগিয়ে থাকে সে জাতি তাই উৎপাদন ও অর্থনীতি সূচকে এগিয়ে থাকে। এখানে জ্ঞান বলতে উপায়কে বোঝানো হয়েছে। যে উপায় দিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়,মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যায় ও সমাজকে বিনির্মাণ করা যায়। আর দক্ষতা হল তাই যা সময়ের শ্রেষ্ঠ কৌশল ও মানুষের চাহিদা উপযোগী প্রযুক্তিগত অর্জন, যে অর্জনের নিপুণতায় মানুষ সর্বোচ্চ প্রায়োগিক সক্ষমতা কার্যকর করতে পারে। সেই উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যবস্থার সক্ষমতা ও গুণগত মান বাড়ানোর উপর নানামুখী কাজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন করে যাচ্ছে। সরকারি এই সংস্থার ভিশন বা রূপকল্প হল উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধন। উৎপাদনশীলতায় তাদের উৎকর্ষ সাধনের সফলতায় এশিয়ায় আমাদের দেশের অবস্থান ক্রমোন্নতির দিকে।

এই ক্রমোন্নতি সম্ভব হচ্ছে দেশের শিল্প কারখানা ও সেবা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ,গবেষণা, কারিগরি সহায়তা প্রদান করায় এবং উন্নয়নমূলক নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বিধায়। সমাজকে সক্রিয় থাকতে হয় ভবিষ্যৎমুখীতায়। কিন্তু সময় উপযোগী দক্ষতায় ভোক্তাদের চাহিদা মোতাবেক গুণগত মানের পণ্য যোগানে সমাজের সম্ভব না হলে সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশ শ্লথ হয়ে পড়ে, ভবিষ্যৎমুখীতা বা অগ্রায়নে থাকা সম্ভব হয়ে উঠে না। তার গতি আবার হরাইজোন্টালিও থাকতে পারে না নিম্নমুখী তথা প্রতিক্রিয়াশীল বা ধ্বংসাত্মক হয়ে পড়ে। এই জন্য শুধু শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করলেই হয় না। তাতে ভবিষ্যৎমুখী প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিশ্চত করতে হয়। কারখানার চাহিদা উপযোগী সুদক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি আধুনিক কৃতকৌশলে সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করতে হয়। এর জন্য দরকার জাতীয় পর্যায়ে নানা প্রশিক্ষণের যাতে চলমান চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে, এগিয়ে থাকতে পারে।

এক জরিপে দেখা যায় শ্রমের উৎপাদনশীলতায় গুণগত মান ৮.৭% বৃদ্ধি করে চীন সর্বাগ্রে থাকতে সক্ষম হয়েছে। এরপর ভিয়েতনাম, এর পর ভারত। ৩.৫% বাড়ানোর সক্ষমতা দেখিয়ে বাংলাদেশের ৫ম স্থানে উঠে আসা সম্ভব হয়েছে। আমাদের জানান দিচ্ছে আমরা ইলিশ যোগানে ১ম, তৈরী পোষাকে ২য়, প্রবাসি আয়ে ৮ম,আর সবজিতে ৩য়, মিঠা পানির মাছে ৩য় ইত্যাদি। আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারতাম যদি যেসব সূচকে উৎপাদনশীলতার হার বাড়ে সে সব সূচক বা নির্ধারকের ব্যাপারে জনসচেতনতার পাশাপাশি শিল্পবিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুতির নানা দিকে আমাদের দক্ষতা প্রকাশ সম্ভব হত। গাড়িটি শুধু চললে তো হবে না। গাড়িটি ভোক্তাদের চাহিদা ও রুচি মোতাবেক কতটুকু সহজ ও উন্নত সেবা দিচ্ছে তা যেমন দেখতে হবে, ভোক্তা বা ক্রেতার পরিবেশে কতটুকু অভিযোজিত ও সহজলভ্য তাও দেখতে হবে। আজকের আলোচনাকে এই পরিধিতে রাখার সচেষ্ট থাকার চেষ্টা করব।

একমাত্র মানুষের মেধা-মনন বিকাশমান ও সৃজনশীল হয়। তাই আজকের মানুষ আর কালকের একই মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়ে যায়। মানুষের ভিতরের সুপ্ত সক্ষমতা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। আর সেই বিকাশের পথ ধরে, একমাত্র সেই সৃজনশীল সুপ্ত সক্ষমতার অধিকারী প্রাণীটিই শুধু, গুহা থেকে বের হয়ে বন্য থেকে এই সভ্য সমাজ গড়তে ও পৌছাতে পেরেছে। অন্য প্রাণীদের সেই সক্ষমতা নেই বলে তারা গুহাতেই থেকে গেল, বন্য রয়ে গেল। তাই সিংহ সিংহই থেকে যায়,তার মধ্যে সিংহের গুণাবলীর কোন অপূর্ণতা দেখি না। কিন্তু মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা সমাধানে সৃজনশীলতায় সক্ষমতা দেখাতে হয়, অতীত অভিজ্ঞতা বা ইতিহাস কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের সফলতার দিকে যেতে হয়। অন্য কোন প্রাণী অতীতকে কাজে লাগাতে পারে না, ভবিষ্যতের দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হতে পারে না। আমরা পারি। আমরা মানুষ বলে। আমরা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সক্ষমতা রাখি। প্রকৃতি ও সমাজ বদলাতে পারি। আমাদের আরও সহজ ও উন্নত জীবনের জন্য। এই জন্য আমাদেরকে উদ্ভাবন করতে হল নানা কিছু, ঘটাতে সম্ভব হল কত ধরণের বিপ্লব। বিপ্লব মানে হল চলমান অবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে দ্রুত আরও উন্নত অবস্থায় পৌছানো। আর বিকাশ মানে হল তো চলমান অবস্থার সংস্কার, আর সংস্কারের মাধ্যমে আরও ভালোর দিকে, সহজের দিকে যাওয়া, যা ধীরে ধীরে সম্ভব হয়।

মানুষের বিপ্লব বা বিকাশ ঘটানোর এই সক্ষমতার জন্য মানুষকে নানা চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। জেমস ওয়াট সাহেব বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন করলেন। এই উদ্ভাবনটি মানুষের হাতে দিয়ে দিল গতি, বাড়াতে সক্ষম হল পণ্যের স্থানান্তর।

বেড়ে গেল কয়লা আর ইস্পাতের ব্যবহার। যাকে আমরা ১ম শিল্প বিপ্লব বলছি (১৭৬০-১৮২০)। বিজ্ঞানের নানা তথ্য-তত্ত্ব দিয়ে মেগা ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৃতকৌশল হল এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন। এই প্রযুক্তিটি শিল্প কারখানায় এনে দিল বড় ধরণের সুবিধা। ঘটে গেল এই বিপ্লব। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবে যারা অংশীজন হতে পারল বা অভিযোজিত হতে পারল তারা ধনবান বা তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির হয়ে উঠল। আর যারা বা যে দেশ তা পারল না তারা পিছিয়ে পড়ে গেল। অন্য কথায় তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতায়-অক্ষমতায় শ্রেণি বৈষম্য বাড়ার পথ তৈরী হল। আরও তৈরী হল দক্ষ আর অদক্ষ শ্রমিকের। প্রযুক্তির জন্য তো সেই প্রযুক্তি চালাতে পারে এমন শ্রমিকই লাগবে বা দক্ষ শ্রমিক লাগবে।

১ম শিল্পবিপ্লব ঘটাতে পারলেও কাজের ব্যাপ্তি সহজে বাড়ানো গেল না। সূর্যের আলোতে কাজ চলে,কৃত্রিম আলো বা ডেভিড হেয়ার ল্যাম্প দিয়ে কতইবা করা যায়। উদ্ভাবিত হল বিদ্যুৎ এর। আমাদেরকে দিল আলোকিত বিশ্ব। কাজের ব্যাপ্তি ও প্রযুক্তিগত বিকাশে উৎপাদন বেড়ে গেল হাজার গুণে। এই উৎপাদন হাজারগুণ বেড়ে যাওয়ার সময়কালকে আমরা বলছি ২য় শিল্প বিপ্লবের যুগ (১৮৭১-১৯১৪)। মানুষের হাতে গতি (১ম শিল্প বিপ্লব) আর আলোকিত বিশ্ব ও কাজের ক্ষমতা তথা উৎপাদন হাজারগুণ বেড়ে গেলে কি হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশ্ব ব্যাপী দ্রুত ও সমন্বিত না হওয়ায় বিকাশের পথে অন্য ধরণের অন্তরায় দেখা দিল। পূর্বোক্তিতে বলা আছে মানুষ বর্তমানকে নিয়ে স্বস্তিতে-তৃপ্তিতে থাকতে পারে না। সিংহ শতভাগ সিংহ হলেও মানুষ কখনও শতভাগ মানুষ হতে পারে না। নিজেকে অপূর্ণ ভাবে। তাই তাকে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে যেতে হয়; পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য, শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার জন্য। তাই দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবেও নানা অপূর্ণতায় ভোগে মানুষ। এক সময় সেই অপূর্ণতায় পূর্ণতায় যোগ করতে সক্ষম হয় কম্পিউটার ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির। এতে জগত চলে আসে মানুষের হাতের মুঠোয়। উদ্ভাবন ঘটে প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার ব্যবস্থা। যাকে বলা হচ্ছে ৩য় শিল্প বিপ্লব। দ্রুত গতিতে হাজারো তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সমন্বিতকরণ ও স্থানান্তর করা সম্ভব হওয়ায় বড় পরিসরের কাজে গতি আসল। তথ্য মানে হল কোন বিষয়ে সন্দেহ দূর করার মত কোন জানার বিষয়। সূর্য আমাদের দিনে আলো দেয়। এই জানার বিষয়টা তথ্য না। তা সবাই জানে, নিত্যসত্য। তা বলে কাউকে নিশ্চিত করতে হচ্ছে না। কিন্তু জনাব রফিক সাহেব খুব ভাল মানুষ, আজ রাতে বৃষ্টি হবে ইত্যাদি তথ্য। যা শ্রোতার সন্দেহ দূর করা হচ্ছে। যা সে আগে জানত না, জানলেও সন্দেহ থেকে যেত। যাক যেই কথা বলেছিলাম, শুরু হল কম্পিউটার ও অবাধে তথ্য প্রবাহের যুগ। হাতের মুঠোয় চলে আসলো পুরো বিশ্ব। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের যুগ এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে তখন কোন দেশের সাক্ষরতার হার বেশি তার চেয়ে বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠে কোন দেশের কম্পিউটার ব্যবহারের হার কত তার হিসাব জানা। যে দেশ কম্পিউটার ব্যবহারে এগিয়ে সেই দেশ উৎপাদন গতিতে ও অর্থনীতিতেও এগিয়ে। তখন দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মিটানো ছাড়া একটি দেশের এগিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠে। শুরু হয় ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ দেয়া। প্রশিক্ষণ মানে মানুষের ভিতরে সুপ্ত থাকা সক্ষমতার প্রকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধি। এই ৩য় শিল্প বিপ্লবের যুগেও মানুষের সৃজনশীলতার আরও উন্নত বিকাশ ও প্রকাশ ঘটতে থাকে নানা কৃতকৌশলে ও তথ্য প্রযুক্তিতে।

প্রযুক্তিগত নানা যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ও সেবা কেন্দ্রে আবশ্যক হয়ে উঠে। তার সাথে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কম্পিউটার ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির নানা ডিভাইসের সাথে প্রয়োজনীয় বন্ধুর ও ডিভাইসের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ যাতে চাহিদা মোতাবেক দ্রুত সেবা পাওয়া যায়। এর জন্য ঘটল ডিজিটাল বিপ্লব। তথ্যের স্বচ্ছতা,তথ্যপ্রযুক্তি খাতে পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, মোবাইল ডিভাইস,স্মার্ট সেন্সর ইত্যাদির উদ্ভাবন করা হল। এতে শুরু হল ৪র্থ শিল্প বিপ্লব। একবিংশ শতাব্দির শুরুতে তথা দ্বিতীয় দশকে শুরু সানফ্রান্সিসকোতে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের কেন্দ্র উদ্ভাবন করা হয়। মানুষের দৈহিক ও মস্তিষ্ক সকল ধরণের শক্তি, এমন কি সৃজনী শক্তিও (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এখন প্রযুক্তি দিয়ে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন হাতের মুঠোয় পৃথিবীর সকল ধরণের কাজ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিতে চলছে। বাংলাদেশও ডিজিটাল দেশ হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

এখন আমাদের শিল্প কলকারখানায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেখানে এখনো শুরু করেনি সেখানে শুরু করতে হচ্ছে। আর "এক বিশ্ব, এক গ্রাম" এর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আমাদের এখন শিল্পকলকারখানার উৎপাদন বাড়াতে ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হচ্ছে। যার জন্য শিল্প কলকারখানাগুলোর আধুনিকায়ন তথা ডিজিটালাইজিং করার পাশাপাশি ডিজিটালি দক্ষ কর্মীবাহিনী নিশ্চিত করতে হচ্ছে। এর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণে অর্জিত দক্ষতা প্রয়োগের তদারকি, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা দিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পরিদর্শনের কাজ নিশ্চিত করা জরুরি। তার সাথে আরও যে বিষয়টি জরুরি তা হল ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগিতা ও সুবিধার বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীর ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে উপর্যুক্ত বিষয়াদিতে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন তিন দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার জন্য ২রা অক্টোবর আনন্দঘন পরিবেশে পালন করা হয় "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস"। জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য ও তার গুরুত্ব জাতীয় পর্যায়ে অনুধাবনের সুযোগ করে দেয়ার জন্য এই দিবসটি পালন করা হয়। আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করা সহ নানা আয়োজনের মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়।

বর্তমান উন্নয়নবান্ধব সরকারও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী কলকারখানা ও কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পবিপ্লবের নানা ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠার কাজে হাত দিয়েছে। ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইটেক পার্ক স্থাপন করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য নানা প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। যাতে দক্ষকর্মী বাহিনী বানিয়ে ঝুঁকি কাটিয়ে আমরা উৎপাদনশীলতায় শীর্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া নিশ্চিত থাকে।

এনপিও এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয় অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্প

মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
ও
প্রকল্প পরিচালক, এনপিও

ভূমিকা:

আমরা সকলেই অবগত আছি, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি দপ্তর। দপ্তরটি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা পরিচালনা; কনসালটেন্সি সেবা প্রদান; দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস পালন; শ্রেষ্ঠ শিল্প পতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ও ইনস্টিটিউশনাল এপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান; এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) এর বিভিন্ন কর্মসূচি বাংলাদেশে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন; বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি মাস্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০ বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে।

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কে টেকসই করার জন্য অন্যতম পথ হলো অর্থনীতির প্রতিটি খাতের কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। বর্তমান বিশ্বে সকল প্রগ্রতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদনশীলতার কার্যক্রমকে ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রকল্পের পটভূমি:

যে কোন দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্তেও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব । উৎপাদনশীলতা বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্য-নির্বাহী কমিটির দ্বাদশতম সভায় এনপিওকে দক্ষ পেশাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় সরকারের রাজস্ব বাজেটের পাশাপাশি পিপিপির আলোকে বিভিন্ন দাতা সংস্থার নিকট এনপিও'র পেশাজীবি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহন করা হয় । প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০১.৯৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০২০ খ্রি: হতে ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি: নির্ধারণ করা হয়েছে ।

বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনিয়র কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করায় এ দপ্তরের দক্ষ জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। দক্ষ জনবল ও জনবলের স্বল্পতার কারণে স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আলোচ্য প্রকল্পে জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স (টিওটি) প্রোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। টিওটি হতে আহরিত জ্ঞান দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবা সেক্টরের মালিক, কর্মকর্তা ও শ্রমিকগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে তারা তাদের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে, যা ভিশন-২০২১ ও এসডিজি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন বিষয়ক আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ে বিশেষ করে কাইজেন, লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মেটেরিয়েল ফ্লো কষ্ট একাউন্টিং প্রভৃতি বিষয়ে দপ্তরের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

প্রকল্পের লক্ষমাত্রা:

(ক) এনপিওতে নিয়োজিত ৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে আধুনিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বিষয়ে (কাইজেন, লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মেটেরিয়েল ফ্লো-কষ্ট-একাউন্টিং) প্রশিক্ষিত করা;

(খ) দেশের ৬৪টি জেলার ৬৪০০ (ছয় হাজার চারশত) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/সেবা সেক্টরের উদ্যোক্তা, মালিক ও কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা, পণ্য/সেবার গুণগত মান, উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব এবং ক্রেতার সন্তুষ্টির বিষয়ে ধারণা প্রদান করা ।

(গ) দেশের ৩২টি জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/সেবা সেক্টরের ৯৬০ জন উদ্যোক্তা, ম্যানেজার/কর্মকর্তাকে উৎপাদনশীলতা, পণ্য/সেবার মান উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

(ঘ) ২৪টি জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ৭২টি প্রশিক্ষণ কর্মসুচির মাধ্যমে ২১৬০ জন উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক ও কারখানা সুপারভাইজরদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা প্রদান ও প্রশিক্ষিত করা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যাশা:

(ক) এনপিও'র জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

(খ) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মালিক, ব্যাবস্থাপক ও কর্মচারিদের উৎপাদনশীলতা জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে;

(গ) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদনশীলতা এবং পণ্য/সেবার গুণমান বৃদ্ধি পাবে;

(ঘ) প্রকল্পের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও কর্মচারিদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে বা সরকারের ভিশন-২০২১ ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বিদেশী ০৩ জন বিশেষজ্ঞ/প্রশিক্ষক দ্বারা কাইজেন, লীন ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম এবং মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং (এমএফসিএ) এই ০৩টি বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে এনপিও'র জনবলকে ১৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, এতে ০১ দিন করে ফ্যাক্টরী ভিজিট হবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে দপ্তরের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা ও নৈপূণ্যতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের পরিচালিত কর্মকান্ডকে ভিত্তি করে ৪টি ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি করা হবে যা প্রকল্প সমাপ্তির পরেও এনপিও এর প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যাবে ।

বিদেশী প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞান পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে এনপিও'র নির্ধারিত সেক্টরসমূহে (পাট, সেবা, কৃষি, চিনি ও খাদ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন, প্রকৌশল ও আইটি, ফিস প্রসেসিং, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং পর্যটন, ট্যানারী ও লেদার) অবহিতকরণ করা হবে ।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

এনপিও এর একজন উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন । এছাড়াও ০১ জন গবেষণা কর্মকর্তা, ০১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ০১ জন পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী, ০১ জন হিসাব রক্ষক এবং ০১ জন অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক প্রকল্পের কাজে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছেন। প্রকল্পটি যথাসময়ে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও তত্বাবধায়নের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) এর নিয়মিত সভা চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

ক) এনপিও'র জনবলকে শিল্প ও সেবা খাতের আধুনিক উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে (কাইজেন, লীন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং মেটেরিয়েল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং) প্রশিক্ষিত করা;

খ) দেশব্যাপী সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশল বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প/সেবা সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্টদের অবহিত ও প্রশিক্ষিত করা।

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষমাত্রা এবং অগ্রগতি:

ক্র. নং	অর্থ বছর	এডিপিতে বরাদ্দ	অগ্রগতি	বিবরণ	লক্ষমাত্রা		অর্জন	
					সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
১.	২০২০-২০২১	৯৫.০০	৫২.৮০	সেমিনার	০৬টি	৬০০ জন	৬ টি	৬০০ জন
				কর্মশালা	-	-	-	-
				প্রশিক্ষণ	-	-	-	-
২.	২০২০-২০২২	২৯৯.০০	২৮১.৯০	সেমিনার	২৪টি	২৪০০ জন	২২ টি	২২০০ জন
				কর্মশালা	১৩	৩৯০ জন	২৫	৭৫০ জন
				প্রশিক্ষণ	১৫	৪৫০ জন	২১	৬৩০ জন
৩.	২০২০-২০২৩	৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা	এ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪২.৬০ লক্ষ টাকা	সেমিনার	২৫টি	২৫০০ জন	৭টি	৭০০ জন
				কর্মশালা	০৭টি	২১০ জন	০৩ টি	৯০ জন
				প্রশিক্ষণ	২৭টি	৮১০ জন	০৩ টি	৯০ জন
প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত: ৩৭৭.৩০ লক্ষ টাকা (টিএপিপি'র বরাদ্দের ৩৭.৬৬%)								

উপসংহার:

বাংলাদেশ ক্রমেই উন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে । এখন আমাদের লক্ষ্য উন্নত সমৃদ্ধ দেশের কাতারে পৌঁছানো। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের Sustainable Development Goal (SDG) বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে, দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিধায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কলা কৌশলের ব্যাপক চর্চা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হলে মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনমূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, আলোচনা সভা, উদ্ভাবনী কর্মসূচির গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকে যার যার কাজে মনোযোগ ও দক্ষতা বাড়িয়ে, অপচয় কমিয়ে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নই হতে পারে বাংলাদেশের উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি।

উৎপাদনশীলতায় গড়ি দেশ,
সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ

উৎপাদনশীলতা, চর্তুথ শিল্প বিপ্লব এবং গবেষণা

মোছাম্মৎ ফাতেমা বেগম
উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)

ভূমিকাঃ

শিল্প বিপ্লবের শেষের দিকে ইউরোপে সর্বপ্রথম উৎপাদনশীলতার ধারণা উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই আমেরিকার পরিসংখ্যান ব্যুরোর একটি বিশেষজ্ঞ দল সর্বপ্রথম উৎপাদনশীলতার আধুনিক ধারণা সকলের সামনে আনে। পঞ্চাশ শতকে ইউরোপ এবং এশিয়ার অনেকগুলো দেশ দ্রুত উৎপাদনশীলতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৬১ সালে এশিয়ান প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন স্থাপনের পর এ অঞ্চল উৎপাদনশীলতা পরিমাপ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাইলস্টোনে পরিণত হয়েছে। তখন থেকেই উৎপাদনশীলতা বিষয়টিতে সকলের আগ্রহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপব (বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০) হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ এবং স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরুপণ করতে সক্ষম স্মার্ট মেশিন তৈরী করার জন্য বড় আকারে মেশিন-টু-মেশিন যোগাযোগ (এমটুএম) এবং ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) কে একসাথে করা হয়েছে।

উৎপাদনশীলতাঃ

উৎপাদনশীলতা হচ্ছে কম খরচে মান সম্পন্ন উৎপাদিত পণ্য বা সেবা। অন্যভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইনপুট বা কাঁচামাল ব্যবহার করে কি পরিমাণ আউটপুট বা পণ্য উৎপাদন করা যায় তার অনুপাত হচ্ছে উৎপাদনশীলতা।

এছাড়া, উৎপাদনশীলতা বলতে উৎপাদনের দক্ষতাকে বোঝায়। সমপরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে বা কম পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করে সমপরিমাণ উৎপাদন করতে পারলে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। উৎপাদনশীলতাকে নিম্নোক্ত গাণিতিক সমীকরণ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়ঃ

$$\text{উৎপাদনশীলতা} = \frac{\text{উৎপাদিত পণ্য (Output)}}{\text{উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান সমূহ (Input)}}$$

গবেষণার ধারণাঃ

গবেষণা কথাটির সাথে 'কোনো কিছু খোঁজা' বা 'অনুসন্ধান' জড়িত রয়েছে। যদি 'গবেষণা' শব্দের দিকে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে এটি 'গো' এবং 'এষণা' শব্দ দুইটির মিলিত রুপ। এখানে 'গো' শব্দটির অর্থ পৃথিবী এবং 'এষণা' শব্দটির অর্থ হলো অনুসন্ধান করা। এ হিসেবে গবেষণার অর্থ হলো পৃথিবী অনুসন্ধান। তাহলে পৃথিবী অনুসন্ধান মানে কী? পৃথিবী অনুসন্ধান হলো- পৃথিবী, পৃথিবী সংশ্লিষ্ট বিষয়, পৃথিবীতে অস্তিত্ব, পৃথিবীতে বিচরণ করা করছে এমন সকল জীব, পৃথিবীতে একে অপররের ওপর নির্ভরশীলতা, পৃথিবীর নানান সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে কী, কেন, কোথায়, কীভাবে, কতটুকু ইত্যাদি প্রশ্নের অনুসন্ধান করা।

'গো' শব্দের আরেকটি অর্থ হলো কিরণ বা আলো। এ হিসেবে 'গো' এবং 'এষনা'র মিলিত অর্থ। অর্থাৎ 'গবেষণা' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'আলোর অনুসন্ধান'। আলোর অনুসন্ধান মানে কী? এখানে কেন আলোর অনুসন্ধান করতে হবে? 'গবেষণা' প্রত্যয়টির মাধ্যমে কোন আলোর কথা বলা হয়েছে? সত্যিকার অর্থে এখানে যে আলোর কথা বলা হয়েছে তার সাথে সত্য, তথ্য ও যুক্তির আলো। অর্থাৎ উপাত্ত বা তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে কোনো সত্যকে খোঁজার নাম হলো গবেষণা।

গবেষণার ইংরাজীতে প্রতিশব্দ হল Research, অর্থাৎ Re - পুনরায় এবং Search - অর্থ অনুসন্ধান । গবেষণা শব্দের অর্থ পুনরায় অনুসন্ধান করা বা পুনরনুসন্ধান । অর্থাৎ কোনো সমস্যার বিপরিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ উপায়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে ধারবাহিকভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়াকে গবেষণা বলে।

গবেষণা হল এক ধরণের পদ্ধতিগত অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া- যার সাহায্যে আমরা তথ্য সংগ্রহ করে থাকি, সমালোচনামূলক তথ্যের ডকুমেন্টেশন বা নথিকরণ করি এবং নির্দিষ্ট পেশাদার ক্ষেত্র কিংবা একাডেমিক শৃঙ্খলা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসারে সেই ডেটা বা তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে থাকি।

গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

নানান গবেষণাগুলো অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের অন্যতম সেরা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

গবেষণা মানুষকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে বোঝার সুযোগ করে দেয়। এইগুলো গভীরভাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে সাহায্য করে। কিছু ক্ষেত্রে, গবেষণা হল সাফল্যেরই একটা অপরিহার্য অংশ।

অর্থাৎ, গবেষণার ফলাফলগুলো একটা আপেক্ষিক ধারণ হলেও, সমাজে এর অনেক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে; সেগুলো হল-

১. জ্ঞানের সম্প্রসারে গবেষণার মতো ভালো পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানলাভ করতে গবেষণাই হল শ্রেষ্ঠতম উপায়।

২. বিজ্ঞান তথা বিশ্বের সমস্ত বিষয়ই পরিবর্তনশীল, সেক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা জন্ম দেয় আরও অনেক-অনেক তথ্যের যে কারণে, গবেষকেরা প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন তথ্য আহরণের তাগিদে, গবেষণাকে এতো মূল্যবান হিসেবে মনে করে।

৩. গবেষণা-সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর প্রতিবন্ধকতাগুলোকে খুঁজে বের করতে সহায়তা করে।

যার ফলে, গবেষকেরা গবেষণার মাধ্যমে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার সমাধান খুঁজে বের করতেও পারেন।

৪. গবেষণা বিপুল তথ্য সম্পর্কে অবহিত করে তোলে ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা ও মতামত তৈরী করে দেয়। যার ফলে, গবেষণার বিষয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা যায় এবং গবেষণাকে লোকজনের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।

৫. সবচেয়ে অনন্য কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। যাতে, গবেষকেরা সবথেকে প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো বের করে নিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে সহজেই পৌঁছানো যায়।

৬. গবেষণা নানান বিষয়বস্তু সম্পর্কে মানুষদের অবহিত করে তুলতে সাহায্য করে। যা সমাজ কল্যাণের কাজে ব্যবহার করে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।

৭. কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে গবেষণা হল সবথেকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। যা থেকে সমস্যা সমাধানের বহু পথ উন্মুক্ত হতে পারে। অথচ, খাতায়-কলমে অনুসন্ধানের পর, যেটা সবথেকে প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হয়- সেটাই বাস্তবে প্রয়োগ করলে, তা গবেষণা ক্ষেত্রে অনেক সময়, পন্ড শ্রম ও বিপুল খরচের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

৮. কৌতূহলকে উস্কে দিতে গবেষণার কোনো জবাব নেই। আর, গবেষণার মাধ্যমে কৌতূহল নিবারণ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতাকেও বাড়িয়ে দিতে পারে। যার মাধ্যমে আমরা মানসিক দিক থেকে বেশি করে পজেটিভ চিন্তাভাবনা পারব ও আমাদের মধ্যে উদ্বিগ্ন ভাবও অনেকটা কমবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য মানুষের মন সর্বদাই ব্যাকুল থাকে । জ্ঞান পিপাসু মানুষ চিরকাল জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ধাবিত হয়। জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্খা মানব সভ্যতাকে ক্রমশঃ আগে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জ্ঞানের যথার্থতা নির্ধারণ করা গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর আবিষ্কার করা। গবেষণার মূল লক্ষ্য লুকিয়ে থাকা তথ্য বা সত্যকে খুঁজে বের করা, যা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি তা । যদিও প্রত্যেকটি গবেষণা অধ্যায়নের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।সহজ ভাষায় বললে গবেষণায় মূলত আট ধরনের লক্ষ্য হতে পারে :-

গবেষণার তাৎপর্য :-

কোনো কাজের পরিকল্পনা সাধনের ক্ষেত্রে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রাখতে পারে।
কোন প্রসঙ্গ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান করতে গবেষণা পারে।
সমাজে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।
মানুষের মূল্যবোধ ও কুসংস্কারকে দূরীভূত করতে, প্রয়োজনীয় ঐক্য মতের ভিত্তি সৃষ্টি করতে পারে গবেষণা।
আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বা উন্নতির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করতে পারে।
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত অতটা সঠিক ও যথেষ্ট ভবিষ্যত বাণী করতে না পারলেও, সীমিত ক্ষেত্রে বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যত বাণী করতে পারে।

গবেষণার প্রকারভেদ:-

উদ্দেশ্য, গভীরতা, বিশ্লেষণ, সময়, উপাত্ত ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গবেষণা বিভিন্ন রকমের হতে পারে, নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো-উদ্দেশ্য অনুসারে গবেষণা দুই ধরণের, যথা-

১. তাত্ত্বিক গবেষণা (Theoritical Reseach)

যে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহারিক প্রয়োগে নির্বিশেষে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা হয় তাকে তাত্ত্বিক গবেষণা বলে। তাত্ত্বিক গবেষণাকে বিশুদ্ধ গবেষণা (Pure Research), মৌলিক গবেষণা (Fundamental Research), প্রাথমিক গবেষণা (Primary Research) নামে চিহ্নিত করা হয়। তাত্ত্বিক গবেষণা বা মৌলিক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা।যে ক্ষেত্রে কখনো গবেষণা হয়নি সে ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করা অথবা পূর্বে গবেষণা করা হয়েছে কিন্তু সেখানে বিশেষ পরিবর্তন বা নতুন কিছু সংযোজনের জন্য যে গবেষণা পরিচালিত হয় তা হলো মৌলিক গবেষণা বা তাত্ত্বিক গবেষণা।

২. ফলিত গবেষণা (Applied Research)

যে গবেষণার মাধ্যমে তাত্ত্বিক বা মৌলিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তা হলো ফলিত গবেষণা। ফলিত গবেষণার উদ্দেশ্য হলো তাত্ত্বিক গবেষণা বা মৌলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তবিক প্রয়োগ। ফলিত গবেষণা দুই ধরণের, যথা

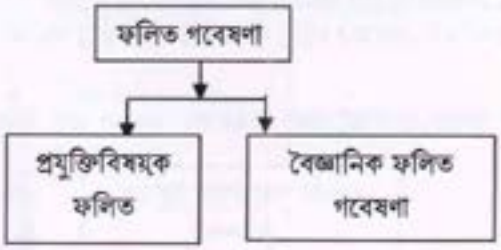

প্রযুক্তিবিষয়ক ফলিত

ক. প্রযুক্তিবিষয়ক ফলিত গবেষণা

প্রযুক্তিবিষয়ক ফলিত গবেষণা সাধারণত যন্ত্র, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সম্পর্কিত হয়ে থাকে। উৎপাদনমুখী কাজে কীভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায় বা ত্রুটিমুক্তভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে যে ফলিত গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে প্রযুক্তিবিষক ফলিত গবেষণা বলে।

খ. বৈজ্ঞানিক ফলিত গবেষণা

বৈজ্ঞানিক ফলিত গবেষণা পরিচালিত হয় পূর্বানুমানের ভিত্তিতে। যে ফলিত গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কোনো বিশেষ জিনিসের (পণ্য বা যে-কোনো কিছু) ব্যবহার উপযোগিতা এবং পরিবর্তনশীলতা নির্ণয় করা তা হলো বৈজ্ঞানিক ফলিত গবেষণা।

গভীরতা ও ক্ষেত্র অনুসারে গবেষণার প্রকারভেদ: গবেষণার গভীরতা ও ক্ষেত্র অনুসারে মোটামুটিভাবে চার ধরনের হয়ে থাকে, যথা-

১. অনুসন্ধানী গবেষণা বা অন্বেষণমূলক (Exploratory Research)

পূর্বের কোনো গবেষণা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলে বা তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে, ওই বিষয় বা জ্ঞানের ওপর স্পষ্ট ধারণা অর্জন ও তার সঠিক ব্যবহার জানার জন্য যে পদ্ধতিগত বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাকে অনুসন্ধানী গবেষণা বলে। কোনো বিষয়ের ওপর পূর্বে পর্যাপ্ত গবেষণ পরিচালিত না হলেও সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানী গবেষণা করা যায়। অনুসন্ধানী গবেষণা অনেকাংশেই তত্ত্ব ও সংগৃহীত নির্ভর হয়ে থাকে।

২. বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Research)

সমাজবিজ্ঞান গবেষণা শাখায় বহুল পরিচিতি একটি গবেষণা হলো বর্ণনামূলক গবেষণা। এতে নির্দিষ্ট সময়, ঘটনা, বিশ্বাস, প্রবণতা, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বর্ণনা করা হয়। এ ধরনের গবেষণায় অনেক সময় পর্যাপ্ত উপাত্ত

সংগ্রহ এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত না করেই ফলাফল প্রদান করা হয়। বর্ণণামূলক গবেষণা আবার বিভিন্ন ধরর হতে পারে, যেমন:

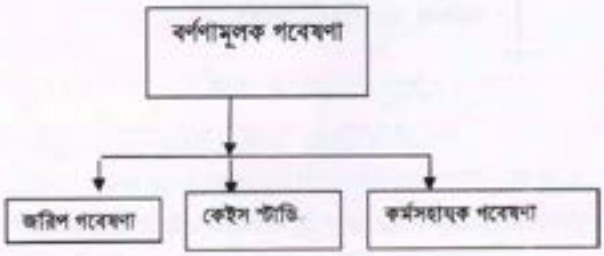

গ. জরিপ গবেষণা
কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে অনেকগুলো সমস্যা বা বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ফলাফল থেকে গাণিতিক বা পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য উদ্ঘাটন করে অনুমিত সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই হলো জরিপ গবেষণা। এটি পরিমাণগত গবেষণারও অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. কেইস স্টাডি
কেইস স্টাডি (Case Study) এর বাংলা অর্থ হলো ঘটনা বিশ্লেষণ বা বিষয়ী অনুধ্যান। কেইস স্টাডির আরেক নাম জীবনেতিহাস। কেইস স্টাডি হলো সামাজিক একেকটি একক যেমন কোনো বিষয়, ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে জানার একটি প্রক্রিয়া।

ঙ. কর্মসহায়ক গবেষণা
কর্মসহায়ক গবেষণা মানে হলো এমন এক প্রকারের গবেষণা যা তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে করা হয়।

৩. ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research)
বর্ণনামূলক গবেষণাকে ভিত্তি করেই ব্যাখ্যামূলক গবেষণার উৎপত্তি। বর্ণনা এই গবেষণার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলেও ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আধুনিক গবেষণায় যত পদ্ধতির বা যত প্রকারের গবেষণা প্রচলিত, সে সবের মধ্যে বর্ণনামূলক গবেষণা অন্যতম। যে গবেষণার মাধ্যমে কোনো কিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে কারণ ও প্রভাব (cause-and-effect) সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে ব্যাখ্যামূলক গবেষণা বলে।

৪. সম্পর্কযুক্ত গবেষণা (Correlational Research)
যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয় তা হলো সম্পর্কযুক্ত বা কোরিলেশনাল গবেষণা (correlational Research)।

ব্যবহৃত উপাত্ত অনুসারে গবেষণার প্রকারভেদঃ গবেষণায় ব্যবহার করা উপাত্ত অনুসারে গবেষণা তিন ধরনের। যথা-

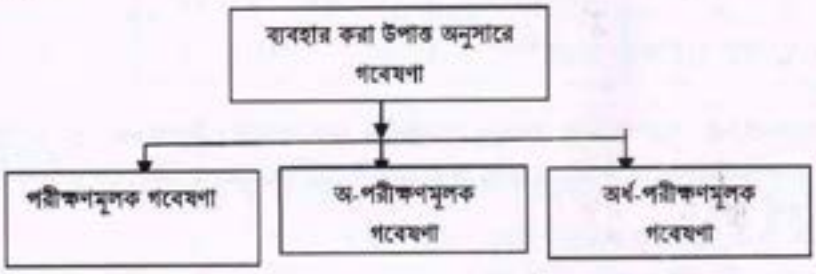

১. গুণগত গবেষণা (Qualitative Research)
গুণগত গবেষণা সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা ধারার সম্ভবত সবয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। যে গবেষণায় প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরাসরি (first-hand) পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় যার সব ই অগাণিতিক তাকে গুণগত গবেষণা বলে। গুণগত গবেষণা করা হয় কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে, তুলনা করতে বা কখনো কখনো সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য। গুণগত গবেষণার ফলাফল গাণিতিক উপায়ে বা পরিসংখ্যানে প্রকাশ করা যায় না।

২. পরিমাণগত গবেষণা (Quantitative Research)
যে গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত সবসময় সংখ্যাসূচক হয় এবং গাণিতিক ও পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয় তা হলো পরিমাণগত গবেষণা। একে সংখ্যাত্মক গবেষণাও বলে। এই গবেষণার একটি রুপ হলো জরিপ গবেষণা, যা বর্ণনামূলক গবেষণারও অন্তর্ভুক্ত।

৩. মিশ্র গবেষণা (Mixed-method Research)
যখন কোনো গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত উভয় প্রকারের উপাত্ত ব্যবহার করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা হয় তা হলো মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। মিশ্র গবেষণার উপাত্ত ও ফলাফল গাণিতিক ও অগাণিতিক।

চলকের ব্যবহারগত দিক থেকে গবেষণার প্রকারভেদ: চলকের ব্যবহার ও ব্যবহারের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত গবেষণা তিন প্রকারের। যথা-

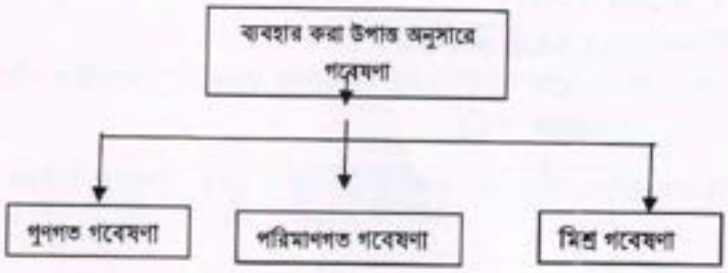

১. পরীক্ষণমূলক গবেষণা (Experimental Research)

নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ হলো পরীক্ষণ। যে গবেষণায় বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে চলকের বৈশিষ্ট্য ও এক চলকের প্রতি অন্য চলকের প্রভাব নির্ণয় করা হয় তাকে পরীক্ষণমূলক গবেষণা বা পরীক্ষামূলক গবেষণা বলে।

২. অ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা (Non-experimental Research)

অ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা হিসেবেও পরিচিত, তবে এই পর্যবেক্ষণ কোনো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পাদন হয় না। যে গবেষণার মাধ্যমে কোনো চলকের ওপর পর্যবেক্ষণ করে তার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু গবেষকের সরাসরি হতক্ষেপ থাকে না তাকে অ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা বলে।

৩. অর্ধ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা (Quasi-Experimental Research)

বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষণমূলক গবেষণা পরিচালনা যখন অসম্ভব বলে মনে করা হয় তখন দৈবচয়নের ওপর ভিত্তি না করে সমগ্র থেকে বাছাই করে কয়েকটি দল গঠন করে প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে যে নকশা প্রণয়ন করে যৌক্তিক মীমাংসায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় তা হলো অর্ধ-পরীক্ষণমূলক গবেষণা বা আপাত-পরীক্ষণমূলক গবেষণা।

অনুমানের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে গবেষণার প্রকারভেদঃ গবেষণায় অনুমান ও এর শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে গবেষণা তিন প্রকার। যথা-

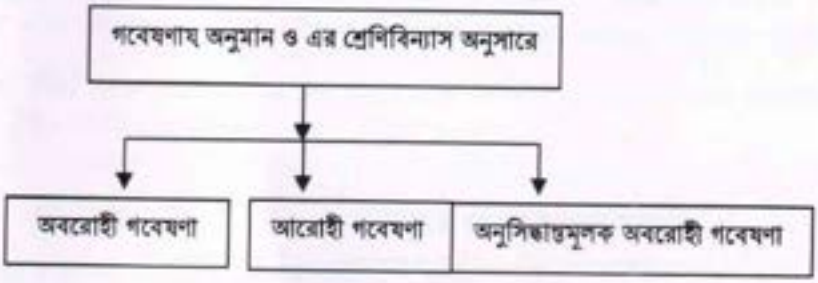

১. অবরোহী গবেষণা (Deductive Investigation)

পূর্বে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা থেকে বা বিবৃতি থেকে সমগ্রকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে ধারণা গঠন করা হয় তখন তাকে অবরোহী পদ্ধতির গবেষণা বলে। অবরোহী পদ্ধতি হলো সূত্র থেকে উদাহরণ গঠনের প্রক্রিয়া। যেমন, 'মানুষ মরণশীল', এ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আশিক, তানজিল, আব্বাসেরও মৃত্যু হবে। এখানে মানুষ হলো সমগ্রক আর আশিক, তানজি

২. আরোহী গবেষণা (Inductive Research)

উদাহরণ থেকে সূত্র গঠন প্রক্রিয়া হলো আরোহী পদ্ধতি। সমগ্রকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে পর্যবেক্ষণ করে বা সূত্র হতে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার সাথে জড়িত গবেষণাকে বলা হয় আরোহী গবেষণা। যেমন- আশিক, তানজিল এবং আব্বাসের মৃত্যু হলো; এখান থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায় যে, 'মানুষ মরণশীল'।

৩. অনুসিদ্ধান্তমূলক অবরোহী গবেষণা (Hypothetical-Deductive Investigation)

যে গবেষণায় প্রথমে সত্যকে পর্যবেক্ষণ করে একটি অনুসিদ্ধান্তে আসা হয় এবং এর পরে অবরোহী পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে ফলাফল আসে তা অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে অনুসিদ্ধান্ত মূলক অবরোহী গবেষণা বলে।

অতিবাহিত সময় অনুসারে গবেষণার প্রকারভেদঃ গবেষণায় ব্যয়িত মোট সময়ের ওপর ভিত্তি করে গবেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. অনুদৈর্ঘ্য গবেষণা (Longitudinal Study)

অনুদৈর্ঘ্য গবেষণা হলো একই চলককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বারবার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া।

এর আরেক নাম প্যানেল স্টাডি (Panel Study)।

২. ক্রস-সেকশনাল স্টাডি (Cross-Sectional Study)

নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ের মধ্যে কোনো ঘটনা, ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সামষ্টিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যে অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তা হলো ক্রস-সেকশনাল স্টাডি।

তথ্যের উৎস অনুসারে গবেষণার প্রকারভেদঃ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের উৎসের আলোকে গবেষণা দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

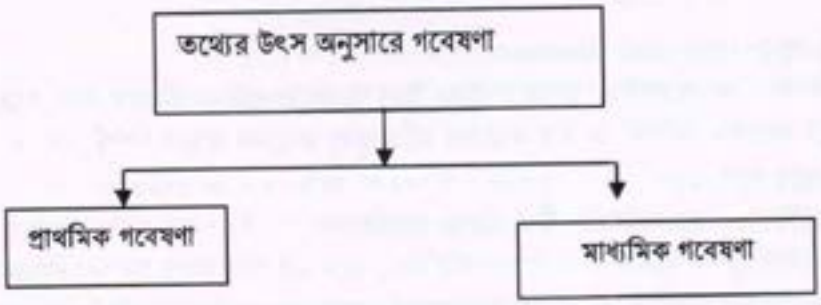

১. প্রাথমিক গবেষণা (Primary Research)

সরাসরি উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে যে গবেষণা পরিচালনা করা হয় তা হলো প্রাথমিক গবেষণা বা মৌলিক গবেষণা। তাত্ত্বিক গবেষণার মতোই এই গবেষণা পরিচালিত হয়। প্রাথমিক উৎস থেকে এই গবেষণার উপাত্ত ও সংগৃহীত হয় এবং তা ফার্স্ট-হ্যান্ড (first-hand) হয়ে থাকে।

২. মাধ্যমিক গবেষণা (Secondary Research)

মাধ্যমিক গবেষণা প্রাথমিক গবেষণার ঠিক বিপরীত। যে অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে মাধ্যমিক উৎস যেমন- সাময়িকী, গবেষণাপত্র, সংবাদপত্র, নথি, চিত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে উপাত্ত নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয় তা হলো মাধ্যমিক গবেষণা।

সংগ্রহের ধরন অনুসারে গবেষণাঃ গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত আহরণের ক্ষেত্র ও ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা চার প্রকার। যথা-

১. ডকুমেন্টারি (Documentary)

ডকুমেন্টারিতে বেশিরভাগ সময় মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ডকুমেন্টারি হলো কোনো বিদ্যমান উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তকে নিয়মতান্ত্রিক পর্যালোচনা করে তা পরবর্তিতে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা অথবা পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত বিশেষে পৌঁছানো। গবেষণা-সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ডকুমেন্টারি পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষণীয়।

২. ফিল্ড রিসার্চ (Fileld Research)

মাঠ গবেষণা বা ফিল্ড রিসার্চ হলো যে গবেষণায় সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে পরিচালিত গবেষণা কর্ম। প্রাথমিক গবেষণার মতোই মাঠ গবেষণা।

৩. ল্যাবরেটরি গবেষণা (Laboratory Research)

পরীক্ষাগারে বা গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিভিন্ন চলকের মধ্যে সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যে গবেষণা পরিচালিত হয় তা হলো পরীক্ষাগার গবেষণা, বা গবেষণাগার গবেষণা বা ল্যাবরেটরি রিসার্চ। পরীক্ষণ গবেষণাই ল্যাবরেটরি গবেষণার নাম।

৪. মিশ্র-পদ্ধতির গবেষণা (Mixed-Method: Documentary, Field and/or Laboratory)

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরি বা ল্যাবরেটরির বাইরে যে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয় তা হলো উৎসের ধরন অনুযায়ী মিশ্র-পদ্ধতির গবেষণা।

পারস্পরিক সম্পর্কীয় গবেষণার ধরন তিন ধরনের, যথা-

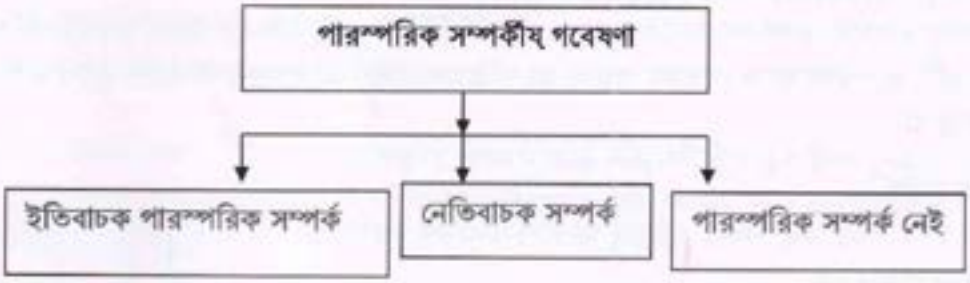

ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক (Positive correlation):

দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক যখন একটি ভেরিয়েবলের বৃদ্ধি অন্য ভেরিয়েবলের বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। একটি ভেরিয়েবলের হ্রাস অন্য ভেরিয়েবলের হ্রাস দেখতে পাবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তির যে পরিমাণ অর্থ আছে তা ব্যক্তির মালিকানাধীন গাড়ির সংখ্যার সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

নেতিবাচক সম্পর্ক (Negative correlation):

একটি নেতিবাচক সম্পর্ক আক্ষরিক অর্থে একটি ইতিবাচক সম্পর্কের বিপরীত। একটি ভেরিয়েবলের বৃদ্ধি হলে, দ্বিতীয় চলকটি বিপরীতে হ্রাস দেখাবে।

পারস্পরিক সম্পর্ক নেই (No correlation):

এটি দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে কোন সম্পর্ক নির্দেশ করে না। অর্থাৎ একটির পরিবর্তনে অন্য একটির পরিবর্তন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোটিপতি হওয়া এবং সুখের কোন সম্পর্ক নেই। অর্থ বৃদ্ধি সবসময় সুখের দিকে পরিচালিত করে না।

গবেষণার ক্ষেত্র ও গভীরতা অনুসারে গবেষণা চার ধরনেরঃ

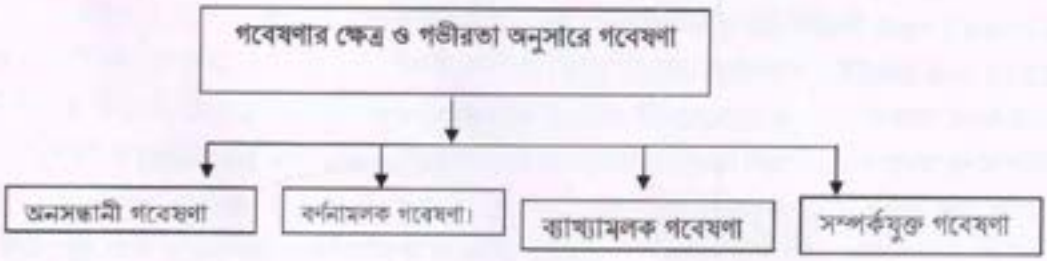

১. অনুসন্ধানী গবেষণা (Exploratory Research)

অনুসন্ধানমূলক গবেষণা হল এমন একটি সমস্যা অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়া যা অতীতে অধ্যয়ন করা হয়নি বা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হয়নি। এই ধরনের গবেষণায় প্রাথমিক উপাত্ত ও মাধ্যমিক উপাত্ত উভয়ই ব্যবহার কার হয়। পূর্বের কোনো গবেষণা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান সু-স্পষ্টভাবে বোঝা না গেলে অথবা তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে, উক্ত বিষয়ের ওপর স্পষ্ট ধারণা অর্জন ও তার সঠিক ব্যবহার জানার জন্য যে বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় তাকে অনুসন্ধানী গবেষণা বলে। কোনো বিষয়ের ওপর পূর্বে পর্যাপ্ত গবেষণা পরিচালিত না হলেও সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানী গবেষণা করা যায়।

২. বর্ণনামূলক গবেষণা (Descriptive Research)

সমাজবিজ্ঞান গবেষণা শাখায় বহুল পরিচিতি একটি গবেষণা হলো বর্ণনামূলক গবেষণা। এতে নির্দিষ্ট সময়, ঘটনা, বিশ্বাস, প্রবণতা, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বর্ণনা করা হয়। বর্ণনামূলক গবেষণায় অনেক সময় পর্যাপ্ত উপাত্ত সংগ্রহ এবং অনুসন্ধান না করেই ফলাফল প্রদান করা হয়।

৩. ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research)

যে গবেষণার মাধ্যমে কোনো কিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে ব্যাখ্যামূলক গবেষণা বলে। বর্ণনামূলক গবেষণাকে ভিত্তি করেই ব্যাখ্যামূলক গবেষণার উৎপত্তি। আধুনিক গবেষণায় বর্ণনামূলক গবেষণা অন্যতম।

৪. সম্পর্কযুক্ত গবেষণা (Correlational Research)

যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে একাধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয় তা হলো সম্পর্কযুক্ত গবেষণা। পারস্পরিক সম্পর্কীয় গবেষণা একটি অ-পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতি যা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের সাহায্যে দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করতে ব্যবহার হয়।

গবেষণার বিভিন্ন ধাপ সমূহ

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এই ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে গবেষণার কাজ সমাপ্ত হয়।

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Problem Identification):

গবেষণার প্রধান কাজ হচ্ছে প্রথমে সমস্যা চিহ্নিত করা। আমাদের চারপাশে অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান। একজন গবেষকের কাজ হচ্ছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করা এবং এর সমাধান বের করা। তবে বুঝতে হবে যে সমস্যাটির আসলে গবেষণার প্রয়োজন আছে কিনা। সুতারাং প্রথমে সেই সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে যা গবেষণার জন্য উপযুক্ত।

২. গ্রন্থ পর্যালোচনা (Review of literature):

সাহিত্য পর্যালোচনা হল গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি প্রধান অংশ। সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর গবেষকের সেই সমস্যা সম্পর্কে বিস্তর জানা-শোনা প্রয়োজন। এটি একজন গবেষককে তাঁর গবেষণা বিষয়ের গ্যাপ সম্পর্কে ধারণা দিবে। এবং সেই সুনির্দিষ্ট দিকগুলোর সমস্যা চিহ্নিত করে তার গবেষণা পরিচালিত করবে। সাহিত্যের যথাযথ পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষক তার অধ্যয়নের ফলাফলের সাথে পূর্বকার ফলাফলগুলির মধ্যে সমন্বয় বিকাশ সাধন করতে পারবে। গবেষকের অনুরূপ বা সম্পর্কিত ঘটনার সাথে পূর্ববর্তী দলিলগুলির এটা একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা বলা হয়ে থাকে।

সাহিত্য পর্যালোচনা করার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি সমূহ:

- এটি অতীতে করা কাজটির সাদৃশ্যতা এড়িয়ে চলে।
- এটি গবেষককে সমস্যা সম্পর্কে অন্যেরা কী বলেছে তা খুঁজে পেতে সহায়তা করে।
- এটি গবেষককে অন্যদের অনুসরণ করা পদ্ধতিগুলির সাথে পরিচিত হতে সহায়তা করে।
- এটি অনুসন্ধানের ধারণা এবং তত্ত্বগুলো প্রাসঙ্গিক কিনা তা বুঝতে গবেষককে সহায়তা করে।
- এটি গবেষককে অনুসন্ধানে কোনও বিতর্ক, দ্বন্দ্ব এবং অসঙ্গতি রয়েছে কিনা তা বুঝতে সহায়তা করে।
- এটি কোনও অনুত্তরিত গবেষণা প্রশ্ন আছে কিনা তা গবেষককে বুঝতে সক্ষম করে।

৩. গবেষণা প্রশ্ন, উদ্দেশ্য এবং অনুমান বিন্যাস করা (Research question, setting goals, and formatting hypothesis:

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করার পরে গবেষকের উচিত গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া। গবেষণা উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে সঠিকভাবে কী গবেষণা করা উচিত, কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং অধ্যয়নের সুযোগের জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করে।

রিসার্চ অবজেক্টিভ বা গবেষণা উদ্দেশ্য হ'ল একটি সুশৃঙ্খল এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা অনুমান। হাইপোথেসিস বা অনুমান হচ্ছে একটি অপ্রমাণিত বিবৃতি বা প্রস্তাব যা প্রতীকী ডেটা দ্বারা খন্ডন বা সমর্থন করা যায়। হাইপোথিটিক্যাল স্টেটমেন্ট বা গবেষণা অনুমানগুলো একটি গবেষণা প্রশ্নের একটি সম্ভাব্য উত্তরে জোর দেয়।

৪. গবেষণার জন্য সঠিক পদ্ধতি ও ডিজাইন নির্বাচন (Research method and design):

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য এবং গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার নীল নকশা বা কাঠামো। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গবেষক তার উত্তর পেয়ে থাকে।

একজন গবেষক তার গবেষণা নকশা বা কাঠামোর জন্য নিম্নে বর্ণিত পন্থাগুলো অনুসরণ করে।

পরীক্ষা (Experiment)
সমীক্ষা বা জরিপ (Survey)
মাধ্যমিক তথ্য অধ্যয়ন (Secondary data study)
পর্যবেক্ষণ অধ্যয়ন (Observational study)

উপরে বর্ণিত ৪ টি কাঠামোর যে কোনটি গবেষণায় ব্যবহার করা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তা হল, সমস্যার ধরণ, উদ্দেশ্য, যে সমস্যাটি অধ্যায়ন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে বিদ্যামান জ্ঞানের অবস্থা, এবং অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স।

৫. তথ্য সংগ্রহ (Collecting Data):

গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ হতে পারে সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে বড় আকারের জরিপ। গবেষণার উদ্দেশ্য, নকশা, সময়, অর্থ, এবং গবেষণার কাজে নিয়োজিত কর্মীদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। ডেটা বা তথ্য গুণগত এবং পরিমানগত উপায়ে সংগ্রহ করা যায়। পরিমাণগত মাধ্যমগুলোর অন্যতম হলো কাঠামোগত সাক্ষাতকার। জরিপ ও প্রশ্নাবলির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৬. ডেটা বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ (Data Processing and analyzing):

৭. প্রতিবেদন তৈরি (Making Research report)

৮. গ্রন্থপঞ্জি বা রেফারেন্স (Citation/bibliography)

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) হল নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা কৌশল যা একটি বিষয় সম্পর্কে তথ্য সনাক্ত, নির্বাচন, প্রক্রিয়া এবং বিশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়। গবেষণা পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল গবেষণার পদ্ধতির পিছনে যুক্তি ব্যাখ্যা করা, ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি, বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং কাজের অন্যান্য মূল বিষয়গুলোকে সমর্থন করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন গবেষক, তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে।

১. কোন ডেটা সংগ্রহ করতে হবে? (গবেষণায় এটিকে ডেটা টাইপ বা কোন ধরণের উপাত্ত ব্যবহার হবে তা নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ: প্রাথমিক ডেটা, মাধ্যমিক ডেটা, গুণগত ডেটা, এবং পরিমাণগত ডেটা ইত্যাদি)।

২. কার কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করতে হবে? (গবেষণায় এটিকে 'স্যাম্পলিং ডিজাইন' বলা হয়)

৩. কিভাবে এটি সংগ্রহ করতে হয়? (এটিকে 'ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতি' বলা হয়)

৪. কিভাবে এটি বিশ্লেষণ করবেন? (এটিকে 'ডেটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি' বলা হয়)

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিঃ গবেষণায় উপাত্ত (Data) ও তথ্য (Information) সংগ্রহের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করা হল,

ক. সাক্ষাৎকার (গ্রুপ আকারে বা একের পর এক): বিভিন্ন উপায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনার সাক্ষাৎকার কাঠামোগত, আধা-কাঠামোগত বা অসংগঠিত হতে পারে। পার্থক্য হল সাক্ষাৎকারকারীকে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলোর সেটটি কতটা আনুষ্ঠানিক। একটি গ্রুপ সাক্ষাৎকারে, গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত বা উপলব্ধি দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

খ. সমীক্ষা (অনলাইন বা ব্যক্তিগতভাবে): জরিপ বা সমীক্ষা গবেষণায়, এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে, যাতে জরিপে অংশ-গ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

গ. ফোকাস গ্রুপ: উপরের গ্রুপ ইন্টারভিউয়ের মতো, গবেষক প্রদত্ত উত্তরগুলোর একটি নোট তৈরি করার সময় একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা মতামত নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি ফোকাস গ্রুপকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ঘ. পর্যবেক্ষণ: মানুষের আচরণের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তবে এটি গবেষণায় ব্যবহার করার জন্য একটি ভাল গবেষণা পদ্ধতি। এই গবেষণার বিভিন্ন উপায়ে অংশগ্রহণকারীদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত। পর্যবেক্ষণ হল একটি নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে পরিচালিত গবেষণা, যেখানে গবেষকরা পরিকল্পনা অনুযায়ী আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন।

তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিঃ

গবেষণার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহের সংকেতায়ন, বিন্যাস, শ্রেণি সরলীকরণ ও ব্যাখ্যাকরণের প্রক্রিয়াকেই তথ্য বিশ্লেষণ বলা হয়। জরিপ, জনসংখ্যাগত তথ্য, অভীক্ষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নথি, ব্যক্তির কথোপকথন, জার্নাল, দিনপঞ্জি ইত্যাদি হতে পারে তথ্যের ও উপাত্তের মূল উৎস। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের পর সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এগুলো বিশ্লেষণ করা। উপাত্তের সঠিক বিশ্লেষণের দ্বারাই কার্যকরী গবেষণা সম্পন্ন হতে পারে। উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, সতর্কতা, নিষ্ঠা ও বিশ্লেষণী মন। এর জন্য কিছু সাধারণ পদ্ধতি ও ধাপ অনুসরণ করতে হয়। উপাত্ত বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইকরণ এবং প্রস্তাবিত সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান। উপাত্ত বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পদ্ধতি হলো:

ক. পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : তথ্যের প্রকৃতি, অবস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই।

খ. অন্তদর্শন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে গবেষক তথ্য বিশ্লেষণে তার পূর্ব অনুমানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করেন এবং অন্তদর্শনের মাধ্যমে সাজিয়ে শ্রেণিকরণ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন।

গ. পরীক্ষণ পদ্ধতি : পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে ধরে রাখা হয় আর সংগৃহীত অবান্তর তথ্য আপনা আপনি বাতিল হয়ে যায়।

ঘ. পরিসংখ্যান পদ্ধতি : গবেষণার জন্য প্রাপ্ত তথ্যকে পরিসংখ্যান বিষয়ের আলোকে সজ্জিত, একত্রিত ও বিন্যাস করা।

উপাত্ত বিশ্লেষণের কিছু ধাপ রয়েছে। উপাত্ত পাঠ, প্রকৃতি চিহ্নিতকরণ, শ্রেণিকরণ ও বিন্যাস, উৎস ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই, সংশ্লিষ্টকরণ, সংগঠন ও উপস্থাপক, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, বিশ্লেষণ প্রাপ্ত তথ্য একত্রিতকরণ, প্রাপ্ত তথ্যসমূহের মাধ্যমে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সাধারণ সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি। এ ধাপগুলো স্বতঃসিদ্ধ নয় তথাপি এগুলো সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

গবেষণা প্রস্তাব লেখার নিয়ম

গবেষণা প্রস্তাব হলো গবেষকের সম্ভাব্য গবেষণা পদ্ধতির একটি বিবরণ। এটির মাধ্যমে রিসার্চার তার গবেষণায় কী নিয়ে গবেষণা করবে, কেন তা গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে গবেষণা কার্য পরিচালিত হবে তার বর্ণনা থাকে।

গবেষণা প্রস্তাব মূলত স্পনসরশিপের জন্য করা হয়। প্রস্তাবের মধ্যে গবেষণার ব্যয়, সময়, এবং সম্ভাব্য ফলাফল মূল্যায়নের একটি ইঙ্গিত দেওয়া থাকে। গবেষণা প্রস্তাবটি যখন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী করবে, তখন এর শব্দের সংখ্যা সাধারণত ২ হাজার থেকে ৩ হাজারের মধ্যে রাখতে হয় এবং পাতার সংখ্যা ৪-৭ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এটি যদি উচ্চতর গবেষণা বা পিএইচডির জন্য তৈরি করার জন্য হয়, তখন গবেষণা প্রস্তাবের শব্দে সংখ্যা এবং পাতার সংখ্যা একটু বেশি হওয়া দরকার।

গবেষণা প্রস্তাব লেখার পদ্ধতিঃ প্রাথমিকভাবে গবেষণা প্রস্তাবে মোট তিনটি মৌলিক অংশ থাকে।

১. আখ্যানপত্র (Title Page) ও সূচিপত্র (Content) ২. প্রস্তাবনার বিভিন্ন দিক। এটি গবেষণা প্রস্তাবের মূল অংশ। ৩. গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যপঞ্জি

প্রথমত, টাইটেল পেজ বা আখ্যানপত্র হলো গবেষণা প্রস্তাবের প্রথম পৃষ্ঠা। এর মধ্যে থাকবে,

- গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবিত শিরোনাম
- গবেষকের নাম
- সুপারভাইজারের নাম
- গবেষকের প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ
- প্রস্তাবের তারিখ

দ্বিতীয়ত, গবেষণা প্রস্তাবের মূল অংশে শিরোনাম থেকে শুরু করে উপসংহার পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। গবেষণা প্রস্তাবের মূল অংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিন্যাস করা থাকে।

- শিরোনাম (Title)
- ভূমিকা (Introduction)
- পটভূমি এবং তাৎপর্য (Background and Significance)
- সমস্যা বিবরণ (Statement of the problem)
- গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Research objectives and purpose)
- গবেষণাপত্র পর্যালোচনা (Literature Review)
- পরিধি এবং সীমাবদ্ধতা (Scope and Limitation)
- গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)
- উপসংহার (Conclusion)

পরিশেষে, গবেষণা প্রস্তাবের একেবারে শেষ অংশে থাকে একটি গ্রন্থপঞ্জি বা তথ্যপঞ্জি (Bibliography)।

গবেষণা প্রস্তাব ও গবেষণা প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্যঃ

গবেষণা প্রস্তাবঃ

গবেষণা প্রস্তাব (Research Proposal) হচ্ছে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ যেখানে একজন গবেষক গবেষণা সমস্যার পরিচয় এবং গবেষণার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করতে পারেন। গবেষণা প্রস্তাবে গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্য, ফলাফল, গবেষণা পদ্ধতি এবং সময় ও বাজেট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উল্লেখ করেন।

গবেষণা প্রস্তাব হল গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি সারাংশ, যেখানে গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য দেওয়া থাকে। গবেষণা প্রস্তাবনাকে গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গবেষণা কর্মসূচির বিস্তারিত বর্ণনা হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে সাধারণত, গবেষণার তহবিল বা স্পনসরের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এটি প্রস্তাব আকারে পেশ করা হয়। একটি গবেষণা প্রস্তাবনা বিভিন্ন ফরম্যাটে তৈরি করা যেতে পারে। তবে, অধিকাংশ গবেষণা প্রস্তাবে একটি ভূমিকা, সমস্যা অনুমান, গবেষণা উদ্দেশ্য, অনুমান, গবেষণা পদ্ধতি, যুক্তিসঙ্গততা এবং গবেষণা প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে গঠিত হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনঃ

গবেষণা প্রতিবেদন বা গবেষণা রিপোর্ট হচ্ছে গবেষক দ্বারা পরিকল্পিত পদ্ধতিতে গবেষণা বিশ্লেষণ এবং সংগঠিত তথ্য উপস্থাপন। গবেষণা প্রতিবেদনকে এক প্রকার প্রকাশনাও বলা যায়। এটিতে গবেষণা সুযোগ, অনুমান, পদ্ধতি, অনুসন্ধান, সীমাবদ্ধতা, সুপারিশ এবং গবেষণা প্রকল্পের উপসংহার সন্নিবেশিত থাকে। গবেষণা প্রতিবেদন হচ্ছে গবেষণা প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রেকর্ড। এটি গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচেনা করা হয়, কারণ রিপোর্ট পত্তত না হলে গবেষণা কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গবেষণা প্রতিবেদন হল গবেষণা কাজের একটি দলিল, যা মানুষকে পুরো গবেষণা ফলাফলের সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য ধারণা দিতে সহায়ক করে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বিস্তৃত গবেষণা কার্যক্রমের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। রিসার্চ রিপোর্ট ভূমিকা, সাহিত্য পর্যালোচনা, পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল ও ফলাফল আলোচনা, গ্রন্থপঞ্জি এবং পরিশিষ্ট নিয়ে গঠিত হয়। একটি গবেষণা প্রতিবেদন (Research Report) গবেষণা প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা। এটির মাধ্যমে গবেষণার কাজ এবং এর ফলাফল তুলে ধরা হয়।

পরিশেষে, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রেক্ষাপটে আমরা অনুধাবন করি যে, শিল্পায়ন তথা জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা একান্ত অপরিহার্য। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের গুণগতমান ঠিক রাখা। বাংলাদেশের শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে পণ্য ও সেবার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদনশীলতার ধারণা ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি লাভ করলেও শিল্প ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ পর্যাপ্ত নয়, উৎপাদনশীলতার উন্নয়নের কৌশল প্রয়োগে যথাযথ সচেতনতার অভাব এর জন্য দায়ী । উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সৃজনশীল কৌশল, কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতির প্রয়োগ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই । বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের দেশের উপযুক্ত শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় রোবোটিক্স ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। সর্বোপরি,টেকসই শিল্পায়ন ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। আশার বিষয় হল যে, বাংলাদেশ সরকার উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ বিগত ২ অক্টোবর ২০১১ইং তারিখে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক বহুপক্ষীয় জাতীয় সম্মেলন এ উৎপাদনশীলতকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেন। তাছাড়া প্রতিবছর ২ অক্টোবর " "জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস" পালন ও দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে 'ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ' প্রদানের ঘোষণা দেন। উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে । তাই বাংলাদেশে বিশেষ করে শিল্প,কৃষি ও সেবা সেক্টরের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে গবেষণাধর্মী পদক্ষেপ নেওয়ার ধারা অব্যাহত রাখতে পারলেই কেবল মাত্র বর্ধিত উৎপাদনশীলতার সুফল পাওয়া যাবে ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবঃ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজে লাগাতে হবে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড

মো: আসমাউল ইসলাম সিয়াম
গবেষণা কর্মকর্তা
গবেষণা শাখা
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
বিসিক, ঢাকা।

এক একটি শিল্প বিপ্লব পাল্টে দিয়েছে সারা বিশ্বের শিল্প উৎপাদন, বাজার ও ব্যবসার সমুদয় গতিপথ, পাল্টে দিয়েছে মানবসভ্যতার ইতিহাস ও মানুষের জীবনাচরণ। প্রথম শিল্প বিপ্লবটি হয়েছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। এরপর ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ ও ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবের গতিকে বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ। বর্তমানে শুরু হওয়া আরেকটি শিল্প বিপ্লব ছাড়িয়ে যেতে পারে আগের তিনটি বিপ্লবকে।

প্রথম শিল্প বিপ্লব উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণে পানিপ্রবাহ এবং বাষ্পশক্তি ব্যবহার করে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে বৃহত্তর উৎপাদনে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়। তৃতীয়টি শিল্প বিপ্লবে উৎপাদনকে স্বয়ংক্রিয় করতে ইলেকট্রনিকস এবং তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগায়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের ভিত্তিমূলের সঙ্গে নতুন নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ঘটে চলেছে। এটা অতিবর্ধিত পরিসরের শিল্প বিপ্লব এবং দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল বিপ্লব, যা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ঘটে চলেছে। বহু ধারার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের এই মিশ্রণ বা যোগফল (**Fusion Technology**) বৈশিষ্ট্যগতভাবে শারীরিক, ডিজিটাল ও জৈবিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় করবে, এদের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনবে কিংবা কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পর্কগুলো আরও জটিল ও অনিয়ন্ত্রিত করে তুলবে।

আমরা একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এর মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রার, কাজ করার এবং একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত হওয়ার পথ ও পদ্ধতিগুলো মৌলিকভাবে বদলে যাবে। বহু উদীয়মান প্রযুক্তির সঙ্গে পঞ্চম প্রজন্মের টেলিকম প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে চতুর্থ শিল্পবিপবের ফিউশন প্রযুক্তির দুয়ার খুলে যাচ্ছে। এ রকম কিছু প্রযুক্তির কথা বলতে গেলে চলে আসবে বহু নাম। যেমনঃ- এজাইল বিজনেস প্রসেস, রোবটিকস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, ত্রি-ডি প্রোডাকশন, পঞ্চম প্রজন্মের টেলিকম, স্মার্টফোনের রিয়েল অ্যাপিকেশন, ইন্টারনেট অব থিংস (**IoT**), ম্যাসিভ কানেকটিভিটি, ম্যাসিভ ট্র্যাকিং, দূর নিয়ন্ত্রণ, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট, ফাইভ-জি ড্রোন, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, বিগ ডেটা ও মেশিন লার্নিং, ক্লাউড ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ব্যাপকতা, চালকবিহীন গাড়ি, ফিনটেক ফাইন্যান্স, ব্লকচেইন ও ভার্চুয়াল কারেন্সি, পেমেন্ট সিস্টেম থেকে জৈবপ্রযুক্তি, রিমোট সার্জারি ইত্যাদি।এই সবকিছু মিলে নতুন এক শিল্প বিপ্লবের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে সারা বিশ্বে। একেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সামনে এক বিরাট সুযোগ হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হচ্ছে একটি দেশের জনসংখ্যার বয়স চিত্রের তারতম্য, যা জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে ঘটে থাকে। বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল আর্থ-সামাজিক কাজে নিয়োজিত করে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার এখনই মোক্ষম সুযোগ। উদাহরণ হিসেবে চোখের সামনেই চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ড ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে অনেক উপরে নিয়ে গেছে।

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুবিধা যদি অর্জন করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় যেমন বাড়বে, তেমনি অধিকসংখ্যক মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকবে এবং সাথে সাথে দেশের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এখন প্রশ্ন হল, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের উপযুক্ত ব্যবহারের জায়গাটি কোথায় তা নির্ধারণ করা। এটি স্বীকৃত যে, এখন পর্যন্ত গার্মেন্ট খাত বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি আয়ের উৎস (৮৬ শতাংশ)। এ খাতবহির্ভূত অন্য কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করে এ কর্মক্ষম যুবশক্তিকে কাজে লাগানো যাবে, তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত, হালকা প্রকৌশল খাত, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি, কৃষি ও সেবা শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে পরিকল্পনামাফিক দ্রুত বিনিয়োগ আবশ্যক। এসব খাতে দেশের এ কর্মক্ষম যুবগোষ্ঠীকে যদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনামাফিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা যায়, তবে এ প্রশিক্ষিত যুবগোষ্ঠী উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিতে পারবে। আর এতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এর সুফল আনয়ন করতে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

নতুন এ শিল্প বিপ্লব থেকে বাংলাদেশকে উৎপাদনশীলতার সুফল নিতে হবে, বৈদেশিক রপ্তানি আয় বাড়ানোর সুযোগ নিতে হবে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে, রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে হবে। এসব দিকে পিছিয়ে পড়া মানে সুফলগুলোর বুমেরাং হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সুযোগটা নিয়ে যাবে অন্য কোনো দেশ আর আমরাও হারাব আমাদের গতানুগতিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো। সুতরাং সুফল ঘরে নিতে চাইলে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কৌশলগতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যমান অদক্ষ শ্রমবাজারকে নতুন দক্ষতার শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে নিতে হবে অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্যে টিকে থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, চতুর্থ শিল্পবিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারকে যুগোপযোগী নীতি গ্রহণ করতে হবে। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড কাজে লাগাতে হবে। কারণ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের মতো সুবিধা খুব কম দেশের হাতে রয়েছে। তাই সম্পদ ও সুযোগের সঠিক ব্যবহার করা এখন সময়ের দাবি।

জাতির পিতার স্বপ্নের দেশ,
উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে বাংলাদেশ

The Fourth Industrial Revolution and Productivity

Ripon Saha
Research Officer
National Productivity Organisation

During the last few decades of the 20th century, Industry 3.0 was a huge leap forward the advent of computer systems and automation ruled the industrial scene. However, in Bangladesh, we did not quite grab the opportunities that came with Industry 3.0 because of amply available labor and access to limited software. Many Bangladeshi organizers were still stuck in industry 2.5, with their paper-based processes and heavy human dependency. Bangladesh is now all geared up to hurl directly into the next revolution i.e. industry 4.0, where machines will be equipped with the ability to communicate.

The Fourth Industrial Revolutions:

Every Industrial Revolution can be considered as a separate era. The First Industrial Revolution used water and steam power to mechanize production, mostly in England. The Second harnessed the advent of electricity to create mass production, and an example could be Henry Ford's Model-T assembly line. The Third, which lasted from the end of the Second World War to the emergence of the Internet, used electronics and information technology to automate production. However, in reality, every era builds on the innovations and changes of the previous era.It leads to more advanced forms of enterprises, careers and jobs, products and services, and productivity.

The Fourth Industrial Revolution is driven by a greater access of information on the Internet through mobile technology, digital devices, and powerful sensors around us. It is a level up, a modern insurgency that connects people, processes and machines. The Industry 4.0 is different from earlier revolutions in its breadth, velocity and depth, and its impact on systems. Fast technological changes are likely to bring wide-ranging impacts to the society. For example, we are already witnessing the impact on our daily lifestyle due to smartphones and internet connectivity. Industry 4.0 is a combination of Industrial Internet of Things (IIoT), cyber-physical systems and artificial intelligence, put together to ultimately make machines capable of making decisions with minimal human intervention. The Industry 4.0 will transform existing technologies and capabilities in the manufacturing and production industry. It is an incorporation or amalgamation of traditional manufacturing practices and sophisticated technology. It is intensive on real-time visibility of the complete value chain, thus allowing for better decisions; and recalibration, which leads to greater efficiency and productivity.

Enablers and Drivers of Industry 4.0 Revolution:

The main disruptive technology driving the fourth industrial revolution are the internet, big data, cloud computing, advanced robotics, artificial intelligence, autonomous vehicle, new

materials, new additive manufacturing technologies especially 3D printing, hybrid manufacturing, machines, and generic and synthetic microbiology.

The leading countries in 4 IR

As to countries you'd clearly have the U.S., China, and Japan in the lead with Germany, South Korea, Taiwan, Singapore, England, France, Norway, Sweden, Finland, Spain, Italy, Switzerland, Qatar, and a few others well along in it with Russia falling further behind and India still struggling to overcome its many impediments, corruption and infrastructure especially as otherwise it would be a much bigger player in the emerging opportunities.

The Fourth Industrial revolution and Bangladesh:

Bangladesh's economic success over the last two decades has been quite impressive. The commercialization of low skilled labor has been at the core of this success. The engagement of low skilled labor into productive activities has not only accelerated economic growth but also increased financial resources at the bottom of the pyramid. As a result, many socio-economic indicators, including poverty, witnessed substantial positive change. In addition, the advancement of ICT infrastructure, the rapid penetration of voice and internet services, and the transformation of service over digital space are strong enabling factors for growth. The end of the 3rd industrial revolution created the scope for integrating low skilled labor force with the global value chain, through the expansion of export-oriented ready-made garment (RMG) industry at home and sending Bangladeshi workers abroad.

In the core of 4IR lies the rise of advanced technologies, and based on the effect of prior industrial revolutions, the need for specialists and engineers adept in those technologies will rise at a similar pace. Emphasis, therefore, should be placed on strategically guiding the existing workforce to adapt while effectively nurturing the future one to excel. This is where the education system and academia steps in.

To tackle the demand for a generation adept in 4IR, the educational structure of today needs to be upgraded. Before higher studies, students should be familiarized, conceptually, with basic STEM curriculum. However, the updated curriculum should not overbear the young minds with a barrage of technical terms and techniques. A school student should not be tasked with perfecting the fundamentals of a programming or scripting language, rather be taught the interesting and fun ways logic and processes, ones they are familiar with in real life, can be structured and configured by themselves.

The most drastic change in curricular structure should be implemented in universities, where the specialization of knowledge and career occurs. A common issue fresh graduates face when embarking on their careers, as seen in IID's survey findings, is the discrepancy between what they have been taught and what is required of them in their jobs. Sometimes this discrepancy can even halt or harm their employment opportunities. To mollify this discrepancy, quantitative and digital literacy, computing skills and internship opportunities should be integrated in fields that have not conventionally required it.

For integration, the teaching learning methods – syllabus, content, delivery medium – must be upgraded regularly through a continuous quality inspection. Universities must identify how new technologies transformed and evolved the respective job markets for each major or field. Moreover, blended learning should be employed on existing courses, by incorporating media beyond the conventional yet irreplaceable face-to-face one, to make these more practicable and applicable in a 4IR-centric workforce.
For the generation already done with their education and in the workforce right now, top-up trainings should be conducted, to accommodate them with the new demand. Top-up trainings or degrees refer to schooling on a specific subject equivalent to that of the final year of undergraduate studies. This means workers in the middle of their career will spend a dedicated time for educating themselves, augmenting their skills and professional assets.

Norms like life-long educational and skill-development practices must be cultured and embedded in both academia and professions alike. To improve their human resources in terms of technological competence, industry should collaborate with the academia. Other than providing schooling facilities, academia, through research, can instruct the industries in the technologies to learn, how best to integrate these into their current business operations and how to evolve according to the shifting waves of the fast-expanding 4IR.

The Fourth Industrial Revolution and Productivity:
Human capital and economic capital form the pillars of a business, and during an economic downturn, both of these take significant hits. The retention of valuable employees becomes complicated by the loss of capital that may result in decreased wages and elimination of positions. It also becomes more difficult to attract the new talent that can help your business recover in terms of productivity. Talented human capital will become even more essential,

and the job market itself will be divided into low-skill/low-pay and high-skill/high-pay positions. In the end, this striation can actually help your business's productivity since you will be able to focus on positions that work with technology to maximize production after a significant downturn.

A Shift from Labour-Intensive Low Productivity to High Productivity

Until recently, the global fashion apparel sourcing has been following a cost-saving model. This is why ready-made garments took off in Bangladesh – the country could provide suitable quality apparel at a meager price due to affordable labor. Around 37 public and private universities produce textile graduates in Bangladesh every year, adding to the skilled workforce available labor. This helps in maintaining quality as skilled labor keeps the quality control of fabrics & designing in check.

Bangladesh has one of the lowest minimum monthly wages for clothing production, which, coupled with the availability of a prominent labor force, made the country an attractive sourcing hub for clothing. In recent years, job creation in the RMG sector has de-accelerated due to increased automation. According to the World Bank, this trend will likely continue and accelerate in the post-pandemic era. So, Bangladesh cannot compete globally with low labor-intensive productivity anymore. Instead, firms need to quickly adopt improved technology across business functions, which will result in higher productivity.

Major Caveats: Unproductive Labor

With the adoption of new technology and automating processes, it is to be expected that the labor force will face unemployment or less growth in employment generation. The introduction of machinery in operations has a higher probability of impacting unskilled and semi-skilled labor compared to skilled labor. A major drawback of the industry is that the majority of the workers are unskilled, and it's these people who will lose out the most due to adoption of 4IR technologies. According to Asian Productivity Organisation (APO) 2020 databook, Bangladesh's labor productivity is one of the lowest among South Asian nations. Automation will also create some jobs in the service sector, but these jobs will require a skilled workforce. Some of the laborers whose jobs will be lost will be diverted to these new jobs, but they will require education and training to be eligible for this. The key reasons behind the unproductive labor of the country are attributed to low wage, lack of training, lack of nutritious food, lack of proper work environment, lack of proper education, and unhealthy living conditions. As the exports of RMG products grew in the last 4 decades, subsequent steps to increase worker productivity have not been taken by the authorities. As most people working on non-managerial roles in the industry are not highly educated, training them for operating automated machines will be a challenge.

Potential Challenges:

There seems to be ongoing debates for dissecting likely implications of 4IR on the labor market. Due to the absence of a robust thinking framework, there have been wild variations in making predictions of 4IR on the global labor market, and Bangladesh is no exception. Likely job loss figures vary significantly from 1.8 million job loss worldwide by 2020 to over two billion by 2030. Such variations often cause confusion, leading to a lack of actions. As a matter of fact, such reality may have created perplexity regarding the acceptance of the likely 5.5 million job loss figures in Bangladesh by 2041. To address this situation, a common thinking framework is needed for bringing clarity among diverse stakeholders, which is vital for developing a shared understanding leading to a synergistic approach of resource mobilization and deployment.

To bring added clarity about likely implications of 4IR on future of work, the focus should change from occupation to task-level analysis. From a few million to billions, high variation in global job loss estimation appears to be due to occupation level focus. But designers of robotics and automation do not target occupation. Instead, they aim for individual tasks. Each of the tasks comprising a profession does not pose the same technological and economic challenge to automate. As a result, transformation takes place at the task level. Moreover, the skill requirement for the individual tasks of an occupation varies. Therefore, the focus needs to be on task-level analysis to improve precision in the estimation of skill transformation.

Conclusion:

Finally, we must recognise that the 4IR is looming just around the corner. It is a grave concern that we might get caught unprepared in some areas. To prepare for the 4IR, Bangladesh's approach needs to be holistic. It is too big of a challenge to be tackled by one ministry or agency. The 4IR will impact not only the IT industry, but also education, agriculture, manufacturing, health, economy, services, and many other areas. This is a challenge of global magnitude, and all the ministries need to collaborate to ensure that they are doing their part to make Bangladesh ready to ride the wave. At the same time, it is also falling on the shoulders of the businesses and trade bodies to do their part by engaging the government to create a win-win situation for everyone. These are uncertain times, and the pandemic has accelerated the pace of 4IR as dependency on technology has increased very quickly. Thus, the speed of the readiness of Bangladesh needs to accelerate to ensure we are fully prepared when the time comes.

The impacts of the 4IR in Bangladesh

Suraiya Subrina
Research Officer
NPO
Ministry Of Industries

The Fourth Industrial Revolution represents a fundamental change in the way we live, work and relate to one another. It is a new chapter in human development, enabled by extraordinary technology advances commensurate with those of the first, second and third industrial revolutions. These advances are merging the physical, digital and biological worlds in ways that create both huge promise and potential peril. The speed, breadth and depth of this revolution is forcing us to rethink how countries develop, how organisations create value and even what it means to be human. The Fourth Industrial Revolution is about more than just technology-driven change; it is an opportunity to help everyone, including leaders, policy-makers and people from all income groups and nations, to harness converging technologies in order to create an inclusive, human-centred future. The real opportunity is to look beyond technology, and find ways to give the greatest number of people the ability to positively impact their families, organisations and communities.

The Fourth Industrial Revolution (4IR) is a term coined in 2016 by Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum (WEF). It is characterized by the convergence and complementarity of emerging technology domains, including nanotechnology, biotechnology, new materials and advanced digital production (ADP) technologies. The latter includes 3D printing, human-machine interfaces (HMIs) and artificial intelligence, and is already transforming the global industrial landscape. Incorporating ADP technologies into industrial production processes has given rise to the concept of Industry 4.0, also known as the Smart Factory – one that learns as it works, continuously adapting and optimizing its own processes accordingly.

As a newly born nation in 1971, Bangladesh had a delayed start to the second industrial revolution. The formative years of the country were spent rebuilding from the damage caused by the Independence War and creating a conducive environment that would eventually set Bangladesh up as a stronger industrial base. It was not until in the boom of the apparel industry that Bangladesh began to reap the rewards of the second industrial revolution. As countries like South Korea moved up the value chain, the low-margin and low-skill apparel industry gradually shifted to countries like Bangladesh. The apparel industry, which has spearheaded Bangladesh's growth story, has allowed the country to absorb a large portion of its workforce, particularly women, into the formal sector. It also created the impetus for policy-makers to embark on an industrialisation strategy that aimed to maximise the benefits of its demographic dividend.

If circumstances delayed Bangladesh's entrance into the second industrial revolution, lack of vision and foresight in the early 1990s played a critical role in delaying the country's entry to the third industrial revolution. It was not until the country's aspirational Digital Bangladesh agenda of 2009, which looked to transform Bangladesh into a knowledge economy by 2021, that there was impetus for policy-makers to understand the power and the benefits of technology.

The programme allowed for the creation of a network of digital centres across the country, reformed the pension system and started deepening financial inclusion. The benefits would have never been so evident had it not been for the covid-19 pandemic, which has disrupted the regular way of life in Bangladesh, as elsewhere. Fortunately for Bangladesh, the investment behind Digital Bangladesh programme helped digitise the government's services. It provided the necessary foundation to take on the mammoth task of implementing virtual classrooms for universities as well as creating 35,000 multimedia classrooms for primary and secondary pupils during the covid-19 pandemic. While technology may not have been at the top of every country's pre-pandemic agenda, 2020 has shown how important, pervasive and critical it can be to help economies stay resilient.

Building on this foundation and seizing the opportunity presented by the covid-19 pandemic, policy-makers in Bangladesh will have to continue to harness new technologies to ensure key opportunities are realised. Unfortunately, this comes with its own set of challenges. While technology has the potential to drive enormous socio-economic breakthroughs, it may also lead to adverse consequences. New technologies and business models of the 4IR era do not fit easily into the traditional framework that regulators use to supervise markets.

In addition to the fundamental question around governance, most discussions around 4IR in Bangladesh focus on the threat of job losses for conventional sectors such as readymade garments. Bangladesh is well situated to take advantage of 4IR. It has a growing manufacturing base, skilled manpower, and a creative entrepreneurial class. On the other side, the level of automation is still weak, the manufacturing sector is limited to garments and a few other minor industries, inadequate infrastructure and the institutions leave much to be desired. If Bangladesh wants to grab the opportunities arising from 4IR, it will need to put in place certain measures to overcome issues around accessibility, affordability, and the application of technologies in a fast-moving global environment.
Fortunately, our leadership is fully cognisant of the potential benefits of 4IR and the enormous tasks that lie ahead. The planning minister assured a gathering of business leaders that the government would provide full support for the formulation and implementation of a national strategy to make Bangladesh 4IR-responsive. The country is poised to review its progress periodically, having set specific growth targets for the years 2026, 2031 and 2041. To name a few, the country aims to graduate from LDC status in 2026, become an upper-middle-income country (UMIC) by 2031 and achieve high-income country status by 2041. In addition, there are 18 development targets to be achieved by 2030 under the UN's Sustainable Development Goals (SDGs).

The most important task in hand for policy-makers in Bangladesh is to acknowledge that any advancement in embracing 4IR technologies will require addressing the way skills development policies are formulated. It is widely recognised that 4IR will create job losses. However, according to the World Economic Forum's Future of Jobs Report 2020, many companies across the world have embarked on a reorientation of their business model. The transformation of production has consequently given rise to new professions and new ways

of working. It will eventually pave the way for greater prosperity despite initial job displacement. As such, the WEF's report estimates that, by 2025, 97 million new roles may emerge to offset the 85 million job losses from the traditional industries. This will create a net job number of 12 million by 2025.

These new jobs will be in sophisticated industries. For Bangladesh, to capture this growth, the public sector needs to provide stronger support for reskilling and upskilling for at-risk or displaced workers. Bangladesh's policy-makers will need to create incentives for investments in the markets and jobs of tomorrow; provide stronger safety nets for displaced workers during job transitions; and decisively tackle long-delayed improvements to education and training systems. In Bangladesh, efforts may need to focus on strengthening the quality of education in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). They will also need to ensure that soft skills are part of the skills development prescription. In Bangladesh, projects such as a2i's current collaboration between Singapore Polytechnic and Singapore's Temasek Foundation should be expanded and encouraged.

In Bangladesh, the pilots of a blockchain-based remittance system and blockchain-based letter of credit transactions have helped reduce the transaction cost and time. These approaches should be encouraged. Instead of regulating the use of blockchain from the top, the Bangladesh Bank can look to create a fintech regulatory sandbox, which would allow financial institutions to pilot these new technologies. Like in the Rwanda example, learning from these pilots, the concerned agencies in Bangladesh – the Bangladesh Bank in close collaboration with the Ministry of Finance and the Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology, – can develop a national blockchain strategy.

To benefit from the 4IR era, there has to be more public–private collaboration. While the private sector provides the necessary stewardship for new technologies, the government will need to protect the public from harm. This will require a higher degree of collaboration than under previous industrial revolutions. Because technology cannot be governed in a traditional way, it is extremely important for both public and private sectors to co-create regulations. In the case of Bangladesh, this precedence has already been created, during the introduction of ridesharing services such as Pathao and Uber. Even during the introduction of mobile financial services in the country there were the co-creation regulations.

To support this framework, Bangladesh can take a similar approach to Italy, which has introduced its Diritto a Innovare, or Right to Innovate, scheme. The legal provision allows start-ups and private sector companies to ask the government for permission to experiment, through a temporary derogation from statutory regulations. The relevant ministry (in the case of Italy the Ministry of Technological Innovation), in conjunction with other relevant authorities, evaluates factors including the feasibility of the proposal, the level of technological innovation and its potential economic, social and environmental impact. Successful proposals are granted the "right to innovate" for a specified period, with certain conditions. At the end of the experimentation period, if the trial has been successful, the ministry evaluates whether and how to introduce revisions to regulations once they are opened to all businesses.

Bangladesh has been highly successful in digitising the government. As the country looks towards 2041, with its aspiration to be a full-fledged knowledge economy, a significant amount of resources need to be invested behind the governance of the digitisation. Policy-makers and industry leaders need to break out from their respective silos. The pace and the scale of technological development render previous the policy-making process inadequate and obsolete. Governing these new technologies will require new principles, rules and protocols that promote innovation while mitigating social costs.

No one technology is going to solve all the country's problems, and achieving Bangladesh's 2041 vision will require innovation in government policies, corporate commitments and individual actions. It will of course need the addition of new technologies. Every tool available will need to be used. With 4IR becoming more powerful every day, the country should encourage policy-makers, innovators and entrepreneurs to use the emerging technologies to address societal challenges.

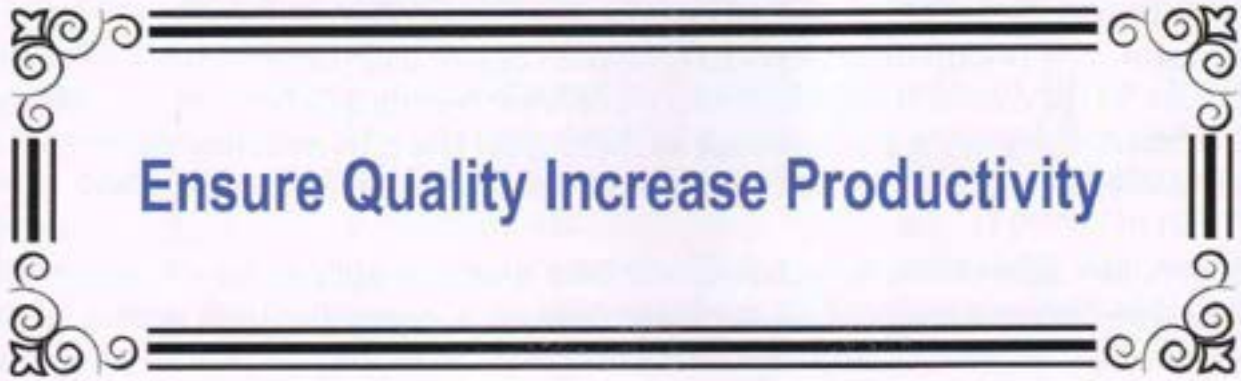

HOW WILL THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IMPACT THE FUTURE OF JOB?

Md. Mehedi Hasan
Research Officer
National Productivity Organisation (NPO)
Ministry of Industries

The Fourth Industrial Revolution is dramatically changing the pattern of labour demand across all countries. Both developed and developing parts of the world are at risk of losing their comparative advantage. It seems like the entire system is transfor ming radically. Many of the mechanically repetitive jobs in advanced countries are already automated.

The exponential growth of computing power and automation is predicted to substitute nearly 50 percent of the US jobs over the next two decades. The job creation rate is rather not very promising; only 0.5 percent of jobs were created in the new industries in 2000 compared to eight percent and 4.5 percent in the 1980s and 1990s respectively.
The global labour market is increasingly adopting new technology. New technology makes it easier for companies to automate routine tasks and could disrupt the balance between job responsibilities completed by humans and those completed by machines and algorithms. With smart technology becoming more mainstream, we need to consider the impact using this new technology will have on our society and workforce.
Transformations and disruptions are already occurring within labour markets across the world. People routinely store images and documents in the cloud, our emails remind us to send follow-ups and we can turn on light bulbs with a simple voice command.
So, will these changes improve or hinder our current standard of living and our future of work? To find the answer, we'll need to explore the Fourth Industrial Revolution a bit closer including its potential impact and benefits.

What is the Fourth Industrial Revolution?

The Fourth Industrial Revolution, also known as Industry 4.0, involves the adoption of cyber-physical systems like the Internet of Things and Internet of Systems.

•Internet of Things. Also known as IoT, the Internet of Things is a network of interconnected smart devices that allow each separate device to interact (i.e. send or receive data) from other devices on the network.

•Internet of Systems. Business-owned systems that can collect data from IoT networks to make independent decisions about your business' marketing campaigns, sales, etc.
As the Internet of Things becomes more mainstream, smart devices will have more access to data which could allow them to become more independent. Eventually, smart devices might have enough information to make autonomously make decisions and control key

business processes like supply chains without human input.

What Impact Will the Fourth Industrial Revolution Have on the Future of Work?

The 4th Industrial Revolution is largely driven by four specific technological developments: high-speed mobile Internet, AI and automation, the use of big data analytics, and cloud technology. Of these four technologies, AI and automation are expected to have the most significant impact on employment figures within the global workforce.

A recent study released by McKinsey Global Institute reports that roughly one-fifth of the global workforce will be impacted by the adoption of AI and automation, with the most significant impact in developed nations like the UK, German and US. By 2022, 50% of companies believe that automation will decrease their numbers of full-time staff and by 2030, robots will replace 800 million workers across the world.

While these figures may sound depressing, it may also simply represent a change within the workforce and displaced employees could, with the right skills, take on more beneficial roles. The World Economic Forum reports that 38% of businesses believe AI and automation technology will allow employees to carry-out new productivity-enhancing jobs while over 25% of companies think automation will result in the emergence of new roles.

Remote Working

In addition to new roles and responsibilities, the 4th Industrial Revolution could also lead to more companies employing specialist contractors or remote workers. Due to new technology and changing demands, employers may also become more supportive of existing employees wanting to work remotely or flexibility.

Giving potential and current employees more freedom to work how, when and where can be very beneficial for companies. It can allow them to recruit a global workforce, increase employee loyalty and commitment, scale at a quicker pace and reach new levels of productivity. Employees benefit too as not having to commute means they'll have more free time, a better work-life balance and greater flexibility leading to overall employee satisfaction and commitment.

What Jobs are the Most Likely to be Impacted?

The 4th Industrial Revolution will impact nearly every industry with The Economist predicting that 50% of jobs are vulnerable to automation. However, some industries are more likely to be automated than others as robots, like human employees, have a particular specific skill set. Within the near future, we can expect to see a reduction in the number of full-time staff in manufacturing and agricultural roles as many of these positions are already being phased out due to increased automation. Robots can also more effectively and safely handle tasks within industrial plants and as such their use in manufacturing dates back as early as the 1970s.

The Organisation for Economic Co-operation and development (OECD) released a list showing the likelihood of roles, within specific industries, becoming obsolete or automated. At the top of the list are occupations within food preparation, construction, cleaning, driving and agricultural sectors.

In addition to manufacturing roles, automation may also impact postal and courier services, shipping and delivery and service industry jobs. Don't see your industry on the list? BBC has put together a handy calculator to help you determine how likely it is that a robot will replace you.

Jobs Least Likely to be Impacted

While robots may be better at quickly, efficiently and safely completing physical, predictable tasks, robots aren't better at everything. Currently, most robots lack social and cognitive skills. They might be able to work as chatbots to answer customer questions and complaints within a given framework, but they generally lack enough empathy to adequately support or care for customers and patients.
As a result, roles that involve recognising cultural sensitivities, caring for others, creative or complex reasoning or perception and manipulation are unlikely to be automated. So, social workers, nurses, nuclear engineers, teachers and writers can rest assured that they won't be replaced by robots any time soon.

The 4th Industrial Revolution's Impact on the Recruitment Industry

According to the 2018 Global Trends report released by LinkedIn, 76% of recruiters and hiring managers think that the 4th Industrial Revolution, or more specifically automation and AI, will have a significant impact on the recruitment industry. Specialist recruiters, especially within sectors that are highly vulnerable to automation, may need to upskill or shift their focus to a new discipline to stay in the game.

Not only will recruiters have to deal with job losses across industries, but aspects of their roles could also be automated. Robots are already being used with the recruitment industry to make recruiters' jobs easier, quicker and more fulfilling. When it comes to talent acquisition, it can be easy to get bogged down in admin tasks like screening resumes or scheduling interviews. Over 52% of talent acquisition leaders admit that their biggest challenge is matching the right candidate to the right role.

AI technology can help. Intelligent screening software, like Ideal, can help recruiters process large volumes of CVs to find the ideal candidate. It examines current employees' skill sets and attributes to find the perfect candidate to join the team. It can even pull information about the candidate from their social media profile or open-source company databases. Chatbots can be used to answer candidates' questions or provide feedback and online interview software can be used to analyse interviewees' answers including their word choice, speech patterns and facial expressions to determine their suitability for the role.

Such innovative technology poses both an opportunity and threat to recruiters. On the one hand, AI technology could allow recruiters to work faster and smarter by streamlining front-end processes, remove boring and dull tasks and ultimately improve the clients and candidates experience. On the other hand, as AI technology becomes smarter, it could eventually replace recruiters.

British Broadcasting Corporation (BBC) reports that human resource administrative workers have an 89.7% chance of being replaced by a robot. However, human resource managers or directors only have a 32.2% chance of being replaced by a robot.

Future of Work

"These transformations, if managed wisely, could lead to a new age of good work, good jobs and improved quality of life for all, but if managed poorly, pose the risk of widening skills gaps, greater inequality and broader polarization." - World Economic Forum, 2018 Report

On some level, workforce changes and technological advancements are normal and to be expected of any developing society. Some worry that the 4th Industrial Revolution could create a dystopian world where robots have taken our jobs and there's a massive wealth disparity between those that own the robots and those that don't. However, automating key tasks could eradicate the more tedious aspects of our jobs and allow human employees to focus on more meaningful, fulfilling tasks.

Here at Change Recruitment, we prefer to think that the Fourth Industrial Revolution will have a mostly positive impact on the future of work. It'll allow us to focus on more meaningful tasks and help people across every industry complete their jobs to a higher standard. We're excited about the upcoming changes and are currently looking for ways to integrate AI technology into our workplace.

What should Bangladesh do?

History suggests that the technological innovation brought by the previous revolutions created more jobs than they had destroyed.
Theoretically, technological innovation enhances productivity, increases wealth, which then increases aggregated demand for goods and services and creates more jobs to meet up the increased demand. The consequence is that there is a positive effect on the long-run economic growth.

However, the application of a new technology always destructs some jobs in the short run, causing "technological unemployment' as termed first by John Maynard Keynes. The total outcome of this creation and destruction depends on the transition process of the displaced workers.

Policies have a very important role here, in upgrading skills of the displaced workers and supporting them during the transition period.

But the Fourth Industrial Revolution is different compared to the previous industrial revolutions, as this will change the nature of jobs in demand and the change will happen at an unprecedented speed across all occupations.

Automation has already started replacing the jobs that require performing repetitive tasks, mostly by the less and semi-skilled workers. It is anticipated that the demand for the high-income cognitive jobs and the low-income manual jobs will increase.

This would imply an inevitable polarisation in the labour market. As the changes will have profound effects, the governments must take right policies to upgrade their human capital. Technological change brought by the Fourth Industrial Revolution will require soft skills such as problem solving, interpersonal skills, collaboration, creative thinking, adaptability etc. The education specialists will face serious challenges to develop these skills using the current curricula, pedagogy and the age-old traditional classroom teaching.
What will be the possible impact of this new revolution on the labour market of Bangladesh? Let me give a brief review of the education system first, as education and other human capital play a key role in this context..

Primary, secondary and tertiary are the three major stages of education in the country. The primary has two streams: general and madrasah education. In addition to these two, the secondary has technical-vocational stream, while tertiary has all three streams, including the general education comprising pure and applied science, arts, business and social studies. The quality of education depends on the quality of the all three stages, as they are inter-related. While basic education serves well in the initial stage of structural transformation (agriculture to industry) of a country (East Asian countries for example), later stages of development require quality secondary and higher education.

Currently, over one third of the population of this country are less than 15 years old, in addition to the fact that we are experiencing demographic dividend. This age group must be prepared with the right kind of skillset required for the 21st century, particularly for the Fourth Industrial Revolution. The country's current education system is not designed to equip the current and future workforce with the skills most likely they will need in the 21st century. More importantly, the sector will not be able to absorb all the students. The Technical and Vocational Education and Training (TVET) could be the solution here, which can prepare our workforce for the future. There are studies suggesting that vocational trainings had better prospects in many students' life compared to the general education system in many countries around the world.

Take, for example, Switzerland. A recent report by the World Economic Forum shows that the country has the most highly skilled workers in the world. What did Switzerland do? Well, 70 percent of the Swiss secondary school children take part in the vocational education training system .Finland is another example, which has one of best education systems

in the world. High school students there follow national curricula. In addition, they practice "teaching collaboration through internship, active citizenship and social awareness with real world applications".

More importantly, participation in the Fourth Industrial Revolution and achieving the country's long-run economic growth objectives will require a knowledge-based society and a large pool of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) graduates, implying that more importance should be placed on higher education.
But this does not mean that the lower level education is less important. Cognitive and behavioural skills of students are developed in pre-primary and primary stage which help them be life-long learners by developing skills such as critical thinking, problem solving etc. at secondary and higher secondary levels. Hence, in order to take advantage of the Fourth Industrial Revolution, we need to stress on all three stages of education, particularly on tertiary education.

Unfortunately, the current trend is just the opposite. More and more business graduates and less and less science graduates are joining our workforce every year. The passing rate in science subjects in SSC and HSC has declined from 50 percent in 1998 to only 36 and 22 percent respectively in 2018, and that of business graduates increased from seven percent to 25 percent during the same time period, according to the latest statistics of Banbeis.This indicates that the current education system is creating skill gap that is generating unemployable graduates. High youth unemployment (10.2 percent) is mostly due to the skill gap. Private sectors are filling up such skill gap by importing foreign nationals, thus raising remittance outflow. Remittance inflow, on the other hand, are not qualitatively increasing, as we export mostly less and semi-skilled workers.

This changed pattern of less and less STEM graduates will create serious labour supply shortage during the Fourth Industrial Revolution. Artificial Intelligence will certainly replace some jobs, resulting in job losses. If we cannot create a pool of STEM graduates urgently for the operation and maintenance of the Artificial Intelligence applications used in our industries, then either foreign nationals will take those jobs or multinationals will restore their business for the same reason, both adding to unemployment.

We need to immediately rescale and upscale the current unemployable graduates and the workers who lost their jobs to Artificial Intelligence. Standing on the threshold of the Fourth Industrial Revolution, we need to focus on our tertiary education now more than ever. The country's human development strategy must be aligned with the need of the Fourth Industrial Revolution as well as the Perspective Plan 2041.

Reference

Professor of Economics at the Department of Economics and Social Sciences, Brac University.
https://www.changerecruitmentgroup.com/knowledge-centre

Importance of Business Excellence Framework to Achieve 4th Industrial Revolution

Md. Moniruzzaman
Research Officer
National Productivity Organisation
Ministry of Industries

An emerging economy like Bangladesh, the 41st largest economy in the world, needs to accelerate its growth of development through increasing productivity in every sector to be more powerful in the world economy. According to the latest report of the *Price Water House Coopers*, Bangladesh will become the 23rd largest economy in the world by 2050. To make this goal happen, the implementation of Business Excellence Framework can play a vital role.

Business excellence framework that recognizes excellent organizational performance has emerged as an essential component of strategies to increase productivity and quality in many countries is also known as a prime contributor to productivity growth through its holistic approach that links enablers to results. The benefits of achieving business excellence in several fields have had a lot of impact on business management and results.

The term "Business Excellence" refers to the systematic use of management principles and tools in business management with the ultimate goal of improving performance and competitiveness. The framework consists of seven strategies namely leadership, planning, information, customer, people, process and results. The Business Excellence Framework model can be shown as follows:

Figure 1.1: BEF Model

In a BEF model, as shown in the above figure, commands from the driving sector of an organisation, that is leadership, go through a systematic process that consists of planning, information, customer, people and process. And after a successful operation in the system area, the expected result appears in time. The BEF model can also be shown differently as below:

Figure 1.2: BEF Cycle Chart

Actually, there are hundreds of tools and techniques that could be applied to BEF. With the introduction of new tools and techniques managers can help employees give their best, through clarifying improvement objectives, training, coaching, counseling, providing ongoing feedback, tracking progress, providing recognition and development. If the BE performance management system is set up as a development system with self-assessments at regular intervals to track progress, and communication has been well managed, then the implementation of new tools and techniques can be smooth and effective.

This Business Excellence Framework has been developed through extensive studies to assess and improve highest work practice and performance. Many countries have developed BEF for assessing and recognizing organizational performance. They also develop and embrace the business excellence framework to encourage the evolution of the products and services with high quality, which that the adoption of business excellence has had a positive impact on organizational practices and outcomes.

We are already in the era of 4th industrial revolution. To meet the upcoming challenges of 4th IR, it is high time for Bangladesh to initialize and adopt this business excellence framework to encourage high-quality achievements and to be recognised internationally.

Be Productive, Think Productive

Increase production through reducing quality variation.

Md. Akibul Haque
Research Officer
National Productivity Organisation

Introduction:

There are lots of scarcity and limitations of resources. Though demand are unlimited and rapidly changeable, it is not the main problem, Problem is the adjustment between mismanagement and allocation of resources, lack of efficient and effectiveness, absence of human intellectual, lack of friendly environment, and supply change etc. If we ensure the reducing quality variation and line balancing in production process then Production and profit will be increased more and more.

What is quality variation:

• Variation is a disparity between an actual measure of a product characteristic and its target value. Excessive variation is outside the upper and lower acceptable limits established for a product specification, which can lead to product discard or salvage.

• Variation is defined as the difference between an ideal and an actual situation. Variation or variability is most often encountered as a change in data, expected outcomes, or slight changes in production quality.

Impact of quality variation:

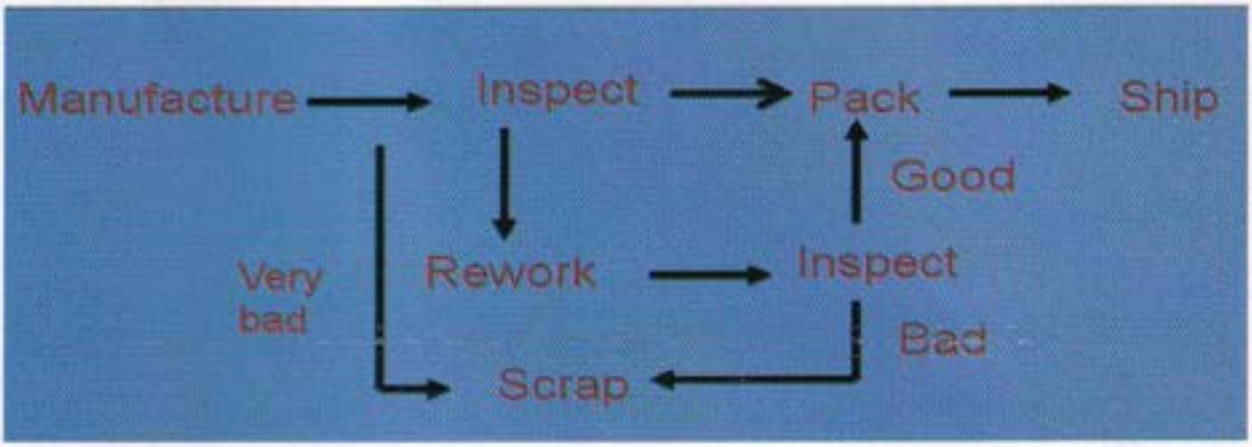

More quality variation creates all types of wastages:

Value & Waste	
Value	Waste
- A capability provided to a customer at the right time at an appropriate price as defined in each case by the customer. -Value is created by the producer. From customer's point of view.	Anything other than the minimum amount of equipment, materials, parts, space and workers time which are absolutely essential to add value to the product. * If it doesn't add Value, It's Waste .

The effects of quality variation are:

- Waste of materials, machines, energy, time, effort ete.
- Defect makes repair / rework, inspection to pick out defects,
- Product defect results into direct waste in manufacturing setups.
- Adding cost to the product due to resource waste, increased production lead time, rework/ repair, inspection personnel, warranty cost, additional delivery cost, etc.

More quality variation in the business processes are the barriers to profit and higher customer satisfaction. For better quality of product, first need to ensure quality input, skilled employees, related training and awareness program, proper monitoring system etc. So more production and profit, ensuring the quality of the production process.

Reference:

APO Training Program.

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি,
স্বনির্ভর দেশ গড়ি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও লীন নীতি

নাহিদা সুলতানা রত্না
গবেষণা কর্মকর্তা
এনপিও, শিল্প মন্ত্রণালয়

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ আমাদের জন্য আকর্ষণীয় সরঞ্জাম এবং নিত্য নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। লীন ম্যানেজমেন্ট (এলএম) গত তিন দশক ধরে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ব্যবসায়িক কৌশলগুলির মধ্যে অন্যতম। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেম, ইন্টারনেট অফ থিংস এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এর মতো অটোমেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে চতুর্থ শিল্প বিপবের সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেখায়। লীনে একটি শব্দ আছে 'Jidoka' সহজভাবে বলা যায় 'Respect for People'. এই"Jidoka" বলতে আসলে যা বোঝায় তা হল মানুষ সব সময় তাদের দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তার যোগ্য কাজ করে কিন্তু মেশিনগুলি অত্যধিক জটিল বা ভারসাম্যপূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করে পাশাপাশি জাগতিক এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অগমেন্টেড এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং ইন্টারনেট অফ থিংসের মতো প্রযুক্তিগুলি বৃহত্তর কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য মানুষ এবং মেশিনকে একসাথে সমন্বয় করে কাজ করে। ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ হল একটি লীন (Lean) সক্ষমকারী নীতি যা কাজকে মেশিন বা প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করে এবং আমাদের লোকেদের যোগ্য কাজের পার্থক্যকে সম্মান করে। Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR) / Virtual Reality(VR) এবং Internet of Things(IoT) টয়োটা প্রোডাকশন সিস্টেমের ১৪টি নীতি গ্রহণকে সক্ষম এবং সমর্থন করে যা লীনের মূল নীতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে আমরা অপচয় কমা, সুন্দর প্রসেস ফ্লো এবং চলমান উন্নতি পরিষ্কার দেখতে পাই। লীনের 'প্ল্যান, ডু, চেক, অ্যাক্ট" বা PDCA Cycle উন্নতিকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের কাঙ্খিত ফলাফলগুলি অর্জন করতে সাহায্য করে। ফলে ম্যানেজাররা সনাতন এবং সম্ভবত ভুল তথ্য বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে প্রদত্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে সঠিক এবং সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহ করতে পারবে।

লীন (Lean) ম্যানুফ্যাকচারিং: লীন (Lean) শব্দের অর্থ হলো লিকলিকে বা চিকণ। ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমে লীন শব্দের ব্যবহার এসেছে মূলত এর শব্দ গত অর্থ থেকেই। 'লীন ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি উৎপাদন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন না কমিয়ে সৃষ্টি অপচয় সমূহ রোধ করা যায়'। অপচয় বলতে বুঝায় এমন কোন বস্তু /সেবা/পদ্ধতি যা উৎপাদনের জন্য জরুরি/উৎপাদনের সময় তৈরি হয় কিন্তু ক্রেতা সেই জিনিসের জন্য কোন মূল্য দেয় না। লীনের ভাষায় অপচয় মূলত তিন ধরনের হয়। (১) 'মুদা-Waste-অপচয়', (২) 'মুড়ি-Over Burden-অতিরিক্ত কাজ ', (৩) 'মুড়া-Unevenness-অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া/কাজ"

লীনের মূলনীতি সমূহ হচ্ছে-

১. নির্দিষ্ট পণ্য দ্বারা যথাযথভাবে মান নির্দিষ্ট করা,
২. প্রতিটি পণ্যের জন্য মূল্য প্রবাহটি চিহ্নিত করা,
৩. বাধা ছাড়াই মান প্রবাহ তৈরি করা,
৪. গ্রাহককে নির্মাতার কাছ থেকে মান প্রবাহ করা এবং
৫. নিখুঁততা অনুসরণ করা

লীন মানুফ্যাকচারিং এর ইতিহাস: ১৮৯৪ সালে সাকিচি টয়োডা নিজস্ব দক্ষতায় প্রচলিত তাঁতের অধিক কার্যকর তাঁত উদ্ভাবন করেন। তিনি ১৯১৮ সালে স্পিনিং ও উইভিং কোম্পানি চালু করেন। পরবর্তীতে তাকে জাপানের 'বিনিয়োগের রাজা (JapanÕs king of Investor) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সাকিচি টয়োডা ১৯২৬ সালে ভুল সংশোধক স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে তাঁতের কাজ শুরু করেছিলেন এবং তাঁত বুননে অপচয় কমাতে সক্ষম হন। ১৯২৯ সালে সাকিচির ভুল সংশোধক তাঁতের (সুতা ছিঁড়েগেলে মেশিন অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়) পেটেন্ট তার ছেলে কিচিরো টয়োডার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে বিক্রি করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে টয়োডা ব্যবসার উন্নতির জন্য অটোমোবাইল ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোটরগাড়ির পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে টয়োডা মোটর কোম্পানি করেন। ১৯৫০ সালের শুরু থেকে বিশেষায়িত পণ্যের (customizes) চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমে যেতে থাকে ফলে পণ্যের দাম বেড়ে যায় ।কিন্তু টয়োডা ভাবল খরচ যদি কমানো যায় তাহলে কম মূল্য পণ্য বিক্রি করে সমান লাভ করা যাবে। তাই তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা খরচ অর্থাৎ অপচয় কমানোর দিকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। ফলে ইউরোপ, আমেরিকার অনেক কোম্পানি টয়োডার কাছে ধাক্কা খাচ্ছিল এবং মার্কেট শেয়ার হারাতে শুরু করেছিল। এই সময় মার্কেটে টিকে থাকার জন্য পুরাতন ব্যাচ পদ্ধতি বাদ দিয়ে জাস্ট ইন টাইম (JIT) মানুফ্যাকচারিং জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯০ জেমস ওমেকের "The Machine That Change The World" বা "যে যন্ত্র পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে" বইয়ে প্রথম লীন মানুফ্যাকচারিং শব্দটি ব্যবহার করেন। তাইচি ওহনো (Taiichi Ohno) টয়োটার উৎপাদন পদ্ধতিতে যে সমস্ত Tool & Technique প্রয়োগ করেছিল তা টয়োটা উৎপাদন পদ্ধতি (Toyota Production System) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে তা লীন ম্যানুফ্যাকচারিং নামে পরিচিতি লাভ করে। তাইচি ওহনো (Taiichi Ohno)-কেই Lean Manufacturing-এর জনক বলা হয়।

লীন ম্যানুফ্যাকচারিং Lean Manufacturing এর মৌলিক ধারনা

লীনের উদ্দেশ্যঃ লীনের অসংখ্য উদ্দেশ্য নেট ঘাটাঘাটি করলে পাওয়া যাবে তবে মনে রাখতে হবে লীন নির্দিষ্ট কোন টুলস/ টেকনিক্স নয়। লীন হচ্ছে " a set of tools/ techniques " যা উপরে বর্নিত পাচঁটি মুলনীতি কে satisfy করে এবং যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপরে বর্ণিত অপচয় সহ জানা-অজানা সকল প্রকার অপচয় রোধ করে এবং এর মাধ্যমে খরচ কমায়।

মূল্য ও অপচয় (Value & Waste):

মূল্য (Value): লীন মানুফ্যাকচারিং এ কোন পণ্য বা সেবার value ক্রেতার দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্ধারিত হয়। কত কঠোর পরিশ্রম করে বা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা তৈরি হল তা ক্রেতার বিবেচনার বিষয় নয়। ক্রেতার বিবেচনার বিষয় হচ্ছে ঐ পণ্য বা সেবা তার চাহিদা কতটুকু পূরণ করছে। প্রসেস এ কোয়ালিটি ডিফেক্ট সারানোর জন্য বা ফ্যাক্টরির অতিরিক্ত মাথাপিছু খরচের জন্য ক্রেতাকে কোন মূল্য পরিশোধ করে না। তাদের চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে তারা পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে।

অপচয়(Waste): লীন মানুফ্যাকচারিং এ waste হচ্ছে সেই সব কাজ যা কোন মূল্য যোগ করে না, কিন্তু খরচ বাড়ায়। টয়োটা প্রোডাকশন সিস্টেমে নিম্নে উল্লেখিত ০৮ ধরনের অপচয়ের কথা বলা হয়েছে তা যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য মারাত্মক অপচয়।

১. অতিরিক্ত উৎপাদন (Over Production):
২. অতিরিক্ত মজুদ (Inventory):
৩. ত্রুটি (Rework/Defects):
৪. অপ্রয়োজনীয় পরিবহন (Transportation) :
৫. অযথা প্রক্রিয়াকরণ (Over processing) :
৬. অপেক্ষা করা (Waiting) :
৭. গতি (Motion)
৮. কর্মচারীদের অব্যবহৃত সৃজনশীলতা (Unused employee Creativity/Talent) :

আমাদের লীন যাত্রা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য আমাদেরকে একটি অনন্য এবং অসাধারণ উপায়ে প্রস্তুত করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে আমরা যে সরঞ্জাম এবং নিত্য নতুন প্রযুক্তি পেয়েছি তা লীন নীতির সাথে পুরোপুরি একীভূত হবে কারণ সেগুলি মূলত একই। ফলে একদিকে যেমন অপচয় কমার পাশাপাশি উৎপাদন খরচ কমে যাবে এবং অন্য দিকে উৎপাদন বহুগুণ বেড়ে যাবে। সর্বোপরি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার,
উৎপাদনশীলতার অঙ্গীকার

উৎপাদনশীলতাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি

সৈয়দ জায়েদ-উল ইসলাম
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন

উন্নয়ন অর্থনীতির প্রধান ধারণা হলো 'উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বৈতবাদ' (প্রোডাকটিভ ডুয়ালিজম) বা উৎপাদনশীলতা। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডব্লিউ আর্থার লুইসের মতো যারা উন্নয়ন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা এ ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ছোট 'আধুনিক' এবং ব্যাপকতর নিম্ন উৎপাদনশীলতার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বড় 'সনাতনী' এ দুই খাত নিয়ে দরিদ্র দেশগুলো বিভক্ত। উন্নত দেশগুলোর বিপরীতে ডুয়ালিজম দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল। গতানুগতিক নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতি থেকে এটি উন্নয়ন অর্থনীতিকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যয়নের শাখা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় স্বভাবতই উন্নয়ন নীতিতে আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নে বৈষম্য নিরসনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। উন্নয়ন নীতির কাজ ছিল নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ডুয়ালিজমকে মোকাবেলা করা। ধারণা করা হয়েছিল, নতুন ব্যবস্থা বাজারকে বদলে দেবে এবং উৎপাদিকা সুযোগের প্রবেশাধিকার বিস্তৃত করবে।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পায়নের যেমন কোনো বিকল্প নেই। একইভাবে সুষ্ঠু শিল্পায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিস্ময়কর চমক সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়নের নানা সূচকে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবা খাতে উৎপাদনশীলতা নিঃসন্দেহে অতীতের তুলনায় বহু গুণ বেড়েছে। এই বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রমের পাশাপাশি নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ খুব সহজেই চোখে পড়ে। আজকাল সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানেই গতানুগতিক, পুরোনো নির্ধারিত কলাকৌশল আঁকড়ে ধরে বসে থাকার সুযোগ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্মকৌশল পাল্টে যাচ্ছে বাস্তব প্রয়োজনে। সরকারি কিংবা বেসরকারি হোক, নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি ও কলাকৌশল উদ্ভাবনের ধারাবাহিক চলমান প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বজুড়ে যে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মানসম্মত উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চলমান রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর।

উৎপাদনশীলতার সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নৈপুণ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলির গুণগত মান। উৎপাদনশীলতা বলতে এক কথায় বোঝায়, আগের অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থা। আগের চেয়ে কম সম্পদ বা উপাদান ব্যবহার করে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি অথবা সমপরিমাণ উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন এবং সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিকে 'উৎপাদনশীলতা' বোঝায়। উৎপাদনশীলতা হলো এক ধরনের ক্ষমতা বা গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য তৈরি এবং সময়মতো ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। গাণিতিকভাবে উৎপাদনশীলতা বলতে উৎপাদন ও উপাদান এ দুয়ের অনুপাতকে বোঝায়। সামাজিকভাবে গতকালের চেয়ে আজকের দিন আরো ভালো এবং আজকের চেয়ে আগামীকাল আরো ভালো যাবে- এ ধরনের চিন্তাভাবনা এবং সেভাবে কাজ করাই হলো উৎপাদনশীলতা। আসলে উৎপাদনশীলতা সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার যত বেশি হবে উৎপাদনশীলতা তত বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উৎপাদনশীলতা হলো সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ব্যক্তি থেকে জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে মালিক, শ্রমিক, ভোক্তা এমনকি সরকারও তার সুফল পেয়ে থাকে। দক্ষতার সঙ্গে এবং কম খরচে পণ্য বা সেবা উৎপাদন মালিক পক্ষের থাকে সব সময়েই। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে পণ্য বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যায়। পণ্যের গুণগত মান উন্নত হলে ভোক্তা শ্রেণি খুব সহজে উৎপাদিত পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে সারা পৃথিবীতে যাদের উৎপাদনশীলতা বেশি তারাই বাজারে টিকে থাকছে বেশ ভালোভাবেই এবং লাভবান হচ্ছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। স্বল্প আয়তনে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এ দেশের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। সরকার কৃষি খাতসহ অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি জাতীয় সব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুধু একটি নির্দিষ্ট খাতের অবদানের ওপর নির্ভরশীল নয়। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় অর্থনীতির সব খাতের সামগ্রিক অগ্রগতি ও অবদান। বাংলাদেশ দিনে দিনে ক্রমেই উন্নয়নের পথ ধরে সামনে এগিয়ে চলেছে। আর উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে এবং দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে শিল্পায়ন তথা অর্থনীতিতে বেগবান ধারা সৃষ্টি করার জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ এরই মধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদায় স্থান করার মানসে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিল্পায়নের বিকাশের জন্য যেমন নতুন শিল্প-কারখানা সৃষ্টি প্রয়োজন, তেমনি কল-কারখানার দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্ত জরুরি। আধুনিক যুগে জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে উৎপাদনশীলতা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া কোনো শিল্পই টিকে থাকতে পারে না।

শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও উৎপাদনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রমিকরা মজুরি বাড়ানোর কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি তুললে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর কথা বলে থাকেন। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলেই শ্রমিকদের মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো সম্ভব হয়। যার সুবাদে প্রতিষ্ঠান ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায় এবং লাভজনক পর্যায়ে পৌঁছে। যে কারণে শ্রমিক পক্ষ এবং মালিক পক্ষ উভয়কেই উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে।শিল্প বিকাশের জন্য যেমন নতুন শিল্প-কারখানা সৃষ্টির প্রয়োজন, তেমনিভাবে এসব কারখানায় দক্ষতা ও মুনাফা বৃদ্ধি করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিও একান্তভাবে অপরিহার্য। দেশের কল-কারখানায়, শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে, কৃষি খামারে, কৃষি জমিতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তির বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে দক্ষ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ জনশক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে। এ কারণে বিদেশে দক্ষ, কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ জনশক্তি রপ্তানির তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।

আজকের দিনে উন্নয়ন অর্থনীতি আবশ্যিকভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা, শ্রম অর্থনীতি, শিল্প অর্থনীতি কিংবা নিম্ন আয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতির মানসম্মত কাঠামোর প্রয়োগ। তবে আরো তাৎপর্যপূর্ণ ও মজার বিষয় হলো, উৎপাদন প্রক্রিয়ার ডুয়ালিজম এখন উন্নত অর্থনীতিগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ও দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ডুয়ালিজম অতিক্রমণে শিল্পায়নই গতানুগতিক হাতিয়ার হিসেবে এখনো থেকে গেছে। শ্রমিকরা উৎপাদনশীল খাতে যত বেশি নিয়োজিত হবেন তত বেশি মজুরি বাড়বে এবং অর্থনীতির সার্বিক উৎপাদনশীলতাও বাড়বে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি, উন্নত দেশ গড়ি

৪র্থ শিল্প বিপ্লব

ফারজানা হক
গবেষণা কর্মকর্তা
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়

অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় সমাজব্যবস্থার শুরু থেকেই মানুষ তার জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দময় করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মানুষের অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানব সভ্যতা আজ উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একের পর এক বিপ্লব মানব সভ্যতাকে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত করেছে। এ পর্যন্ত বিশ্ব তিনটি শিল্প বিপ্লব অবলোকন করতে পেরেছে। সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিটি বিপ্লব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের পর চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এখন কড়া নাড়ছে মানব সভ্যতার দোরগোড়ায়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এখন রয়েছে আঁতুড়ঘরে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যেই তাকে পূর্ণশক্তিতে পাওয়া যাবে।

শিল্প বিপ্লবঃ

শিল্প বিপ্লব হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ উন্মোচিত করা। প্রযুক্তির অগ্রগতিতে রচিত হয় শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস। প্রথম শিল্প বিপ্লব জন্মলাভ করে গ্রেট ব্রিটেনে। ১৭৮২ সালে জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং ১৭৮৪ সালে কার্টরাইটের বাষ্প-ইঞ্জিন চালিত তাঁত (**Power Loom**) এর ব্যবহার উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। বাষ্প ইঞ্জিনকে টেকসই করতে ভারী এবং শক্ত ধাতু হিসেবে লোহার ব্যবহার করা হয় ফলে লোহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও লৌহ খনন, নিষ্কাশন, প্রক্রিয়াজাতকরণের উন্নত কৌশল আবিষ্কৃত হয়। উৎপাদনের এই ধারায় দৈহিক শক্তির স্থান দখল করে যন্ত্রশক্তি। মূলত ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত স্থায়ী এ বিপ্লব কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত এবং কৃষি অর্থনৈতিক। এরপর বাণিজ্যিক ব্যবস্থা আধুনিক শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের পরিধি ছিল প্রথম বিপ্লবের তুলনায় ব্যাপক। ১৭৫২ সালে বিদ্যুতের আবিষ্কার শিল্প উৎপাদনে এক নতুন গতির সঞ্চার করে, ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় ও শিল্প কারখানাগুলাতে তড়িৎ ও অ্যাসেম্বলি লাইনের মাধ্যমে ব্যাপক উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করে। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, শিল্পায়নে দ্রুতগতি, কৃষিতে অগ্রগতির কারণে বাজারের প্রায় সকল পণ্যেরই মূল্য হ্রাস পায়। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের ফলে এই যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা থেকে উদ্ভব ঘটে বৃহৎ পেশাজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণির। শিশুশ্রম হ্রাস পায়, ভোগবাদী ও বস্তুগত সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। যন্ত্র মানুষের স্থান দখল করে অর্থাৎ প্রযুক্তির অগ্রগতিতে সনাতন ধারার শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পায়। দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের ব্যাপ্তি ছিল উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সূচনা ঘটে ১৯৬০ এর দশকে। তৃতীয় শিল্পবিপ্লবকে কম্পিউটার বিপ্লবও বলা হয়। সেমিকন্ডাক্টর, মেইনফ্রেম কম্পিউটার ও ইন্টারনেট এ বিপ্লবের ধারক ও বাহক। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কার তৃতীয় শিল্পবিপ্লবকে চূড়ান্ত গতি দান করে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে মানুষ গতি দিয়ে সময়কে জয় করেছে, ন্যানো সেকেন্ডের হিসাবও যেখানে গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে 'বিশ্বগ্রাম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে নতুন পর্যায়ে। একের পর এক গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প শহর,শিল্প পার্ক। এই সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতি নির্ভরশীলতা ও তার যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশ আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করেছে। ইন্টারনেটের ব্যবহার যোগাযোগ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাকেই আমূল বদলে দিতে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ব পরিমন্ডলে শক্তিশালী অবস্থান তৈরী করেছে। কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ গোটা বিশ্বকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। যে চিঠি মানুষ হাতে লিখতো তা হয়ে গেল ইমেইল, ক্ষুদে বার্তা। বই, সংবাদপত্র স্থান করে নিলো ইন্টারনেট জগতে। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে মহাদেশগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেলো। তবে এ তিন বিপ্লবকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবঃ

সময় এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের, এ শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি হলো তথ্যপ্রযুক্তি। ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী সস্তা সেন্সর, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রাণ। এ বিপ্লবে মেশিনকে বুদ্ধিমান করে তৈরি করা হচ্ছে। মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স, অটোমেশন, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লকচেইন প্রযুক্তি, থ্রিডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, জিন প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ইত্যাদির সমন্বয়ে আজকের বিশ্বে আমরা যে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি তাই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার করেন বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস শোয়াব ২০১৫ সালে 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধে। ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম থেকে প্রকাশিত ক্লাউস শোয়াবের 'দ্যা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' বইটিকে বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বাইবেল। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সহযোগিতায় ইতোমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ সংক্রান্ত সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং, রোবটিক্স ও অটোমেশন, ইন্টারনেট অব থিংস, ব্লক চেইন, থ্রিডি প্রিন্টিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, ম্যাটেরিয়াল সাইন্সের মতো বিষয়গুলোর অভাবনীয় ও অকল্পনীয় অগ্রগতি এবং উন্নতি যেমন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে শক্তিশালী করছে পাশাপাশি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনে এই সকল বিষয়ের উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহার-ই যে হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মূল চেহারা তা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। আগেকার বিপ্লবগুলোর মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি, প্রাণিশক্তি, রাজনৈতিক শক্তি, ভৌগোলিক পরিবর্তন ইত্যাদি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলো থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। অন্যান্য শিল্প বিপ্লবের সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে প্রতিস্থাপন করেছে; কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লব শুধুমাত্র শারীরিক নয়, মানসিক পরিশ্রমকে প্রতিস্থাপন করবে। ক্লাউস শোয়াব চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রসঙ্গে এমন সব প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো হার্ডওয়্যার (Hardware), সফটওয়্যার (Software) এবং বায়োলজি (Biology) একসাথে নিয়ে তথা সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস (Cyber-Physical system)-কে একত্রিত করে এবং পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের অগ্রগতির ওপর জোর দেয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শিল্প বিপ্লবকালে প্রযুক্তির সক্ষমতা বেড়েছে গাণিতিক হারে কিন্তু এখন বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। কম্পিউটারের মাইক্রো-প্রসেসরের ক্ষমতা এখন জ্যামিতিক হারেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গতির কারণেই আগামী ১০ বছরে আমরা এমন এক ডিজিটাল বিশ্ব পেতে যাচ্ছি যা বিগত ৫০ বছরেও সম্ভব হয়নি। বিগত শিল্প বিপ্লবগুলোতে যেখানে মানুষ নিজে যন্ত্রকে ব্যবহার বা পরিচালিত করেছে সেখানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে মানুষ যন্ত্রকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সমৃদ্ধ করছে যাতে করে যন্ত্র নিজেই নিজেকে পরিচালিত করতে পারে।

ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) মানুষ এর দৈনন্দিন জীবনকেই বদলে দেবে। এর মাধ্যমে গৃহের নিত্য ব্যবহার্য ফ্রিজ, টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিনের মতো বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যন্ত্রগুলো পরস্পর ইন্টারনেট এর মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করবে। ঘরের গৃহকর্মী রোবটকে ফ্রিজ খুলে দেখতে হবে না কী কী বাজার রয়েছে, কী কী কিনতে হবে বরং ফ্রিজ নিজে থেকেই রোবটকে জানাবে এবং ই-কমার্সেই প্রয়োজনীয় বাজারসদাই সেরে নেবে, মানুষের মস্তিষ্ক ও শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত খাদ্য তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রস্তুত করে রাখবে, ব্যবহৃত গাড়ি ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র কে তথ্য পাঠিয়ে জানিয়ে দেবে ব্যক্তির অবস্থান। গৃহে পৌঁছেই পাওয়া যাবে শীতল কক্ষ, শরীরের তাপমাত্রা বুঝে নিয়ে এসি নিজে থেকেই তাপ নিয়ন্ত্রণ করবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে এভাবে প্রতিটি যন্ত্রই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবে। আইওটি শুধু গৃহ ব্যবস্থাপনার জন্যই নয় আইওটির মূল লক্ষ্য 'স্মার্ট সিটি' তৈরী করা। যেখানে সিটির ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত আইওটির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। গুগল হোম, অ্যামাজনের এলেক্সার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই আইওটির ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রায় ২০০ বিলিয়ন যন্ত্র আইওটির মাধ্যমে যুক্ত হবে এবং বাজার দখল করে নেবে।

ক্লাউড কম্পিউটিং পূর্বে ডেটা সংরক্ষণ, ডেটা প্রক্রিয়াকরণে কম্পিউটার হার্ডডিস্কের যে সীমাবদ্ধতা ছিল তা দূর করেছে। বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারে যুক্ত হয়ে ডেটা সংরক্ষণ, ডেটা প্রসেসিং এর কাজ করা যাচ্ছে। কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে ডেটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিন্তু ক্লাউড সার্ভারে ডেটা থাকে নিরাপদ। ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের কাজগুলো খুব সহজে যেকোনো স্থানে বসে মোবাইলেই করা যায় এবং এর সফটওয়্যারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপডেট হয়ে যায়। ক্রমাগত ডিজিটালাইজেশনের কারণে প্রচুর ডেটা উৎপন্ন হচ্ছে। এসব ডেটা পূর্বে হার্ডডিস্কের মেমোরির সীমাবদ্ধতার কারণে সংরক্ষণ করা না গেলেও এখন ক্লাউডে স্বল্পব্যয়ে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) রোবট থেকে শুরু করে গৃহের প্রবেশদ্বারকেও স্বনিয়ন্ত্রিত করবে। বাড়ির দরজা মালিককে দেখেই চিনতে পারবে, বন্ধ দরজা খুলে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, কৃত্রিম কণ্ঠে জানাবে স্বাগতম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষরূপী রোবট গণিত শেখাবে, বাচ্চাদের খেলার সাথী হবে, স্কুলেও নিয়ে যাবে, দেবে বাড়ির নিরাপত্তা। এরকম অসংখ্য কাজ এআই সম্পন্ন মেশিন দ্বারাই সম্ভব হবে। ইতোমধ্যেই এআই এর সুবিধা সকলে ভোগ করা শুরু করেছে। গুগলসার্চে এআই ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারে দাবা খেলার প্রতিপক্ষে রয়েছে এআই'র উপস্থিতি। আমাজন কোম্পানি চীনে তাদের গুদামে শেলফ থেকে মালামাল নামাতে ব্যবহার করছে রোবট। বর্তমানে এরকম প্রায় আড়াই মিলিয়ন রোবট কাজ করছে। দিনে দিনে এসব উদাহরণের পাল্লা ভারী হচ্ছে। আমাদের ভৌত জগৎ, ডিজিটাল জগৎ আর জীবজগতের বৃহৎ অংশজুড়ে থাকবে এআই, রোবটিক্স এর বিস্তৃতি।

ডিজিটাল মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনকে নিরাপত্তা ও আস্থাশীলতা অর্জনে সকলে ঝুঁকছে ব্লক চেইন প্রযুক্তিতে। বিশেষত বিটকয়েন নিয়ে মানুষের আগ্রহ ও ক্রিপ্টোকারেন্সির জনপ্রিয়তা ব্লক চেইন প্রযুক্তিকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে। এই প্রক্রিয়ায় লেনদেনের তথ্য লেজারে লিপিবদ্ধ করা হয়। একেকটা লেনদেন একেক ব্লক তৈরী করে। ব্লক চেইনে লেজারটি ছড়িয়ে দেয়া হয় সব অংশগ্রহণকারীর মধ্যে যার ফলে জালিয়াতি করা অসম্ভব। ব্লক চেইন যেমন আর্থিক লেনদেন এর জন্য নিরাপদ তেমনি ডিজিটাল চুক্তি, ডিজিটাল দলিল বিনিময়ের জন্যও অধিক উপযোগী। ব্লক চেইনে লেনদেন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাজ কমিয়ে দেবে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আরেক প্রাণ থ্রিডি প্রিন্টার। চার্লস ডব্লিউ. হাল আধুনিক থ্রিডি প্রিন্টারের আবিষ্কারক। এই প্রিন্টার ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক মুদ্রণের কাজ করে। গয়না প্রস্তুত, পাদুকা শিল্প, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন, স্থাপত্য, প্রকৌশল ও নির্মাণ, মহাকাশ, দন্ত চিকিৎসা, পুরকৌশল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে কৃত্রিম মূত্রথলি তৈরী করা হয়, ২০০৪ সালে থ্রিডি প্রিন্টার দিয়েই থ্রিডি প্রিন্টার তৈরী করা হয়, ২০০৮ সালে মানুষের জন্য তৈরী করা হয় থ্রিডি প্রিন্টেড পা, ২০১১ সালে তৈরী করা হয়েছে থ্রিডি প্রিন্টারের এয়ারক্রাফট, সম্প্রতি এই থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তৈরী করা হয়েছে বাড়ি। দিন যত যাবে মানুষের এর উপর নির্ভরতা যেমন বাড়বে তেমনি থ্রিডি প্রিন্টার নিকট ভবিষ্যতেই অবিশ্বাস্য সবকিছুর প্রিন্ট নিয়ে হাজির হবে সকলের সামনে যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে ভিন্নমাত্রা এনে দেবে। ত্রিমাত্রিক মুদ্রণের এই প্রযুক্তিতেই যেমন তৈরী হবে মানব দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ তেমনি তৈরী হবে ঔষধ থেকে শুরু করে ভৌত অবকাঠামো।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, শক্তি উৎপাদন সহ নানা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। রিচার্ড ফাইনম্যানকে বলা হয় ন্যানো প্রযুক্তির জনক। এক মিটার এর একশ কোটি ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ন্যানো মিটার। যে সমস্ত প্রযুক্তি ন্যানোমিটার স্কেলের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোকে বলা হচ্ছে ন্যানো প্রযুক্তি। ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা হালকা-পাতলা ইলেক্ট্রনিক্স তৈরী হচ্ছে। একসময়ের বিশাল আকৃতির কম্পিউটারের কাজ আজকে মুঠোফোনেই করা সম্ভব করছে ন্যানো প্রযুক্তি। অদূর ভবিষ্যতে ছোট্ট হাতঘড়িটি হয়ে যাবে একটি সুপার কম্পিউটার এই ন্যানো প্রযুক্তির কল্যাণে। ন্যানোটেকনোলজি পদার্থবিজ্ঞান থেকে শুরু করে জীববিজ্ঞান সবধরনের গবেষণাতেই নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশ পাটের জিন রহস্য উন্মোচন করেছে। সামনের দিনগুলোতে এই প্রযুক্তি আরও বিস্ময় উপহার দেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা:

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা ভোগ করতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় বাংলাদেশ যত এগিয়ে যাবে, বাংলাদেশের অগ্রগতি তত ত্বরান্বিত হবে। এ শিল্পবিপ্লবের সময়কালে রোবটিক্স, ক্লাউড টেকনোলজি, ব্লকচেইন, থ্রিডি প্রিন্টিং, ন্যানো টেকনোলজি এবং বায়ো টেকনোলজি প্রভৃতি বিষয়গুলা অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে। তাই বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলে এ তরুণ সমাজকে মানব মূলধনে রূপান্তর করা প্রয়োজন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে চাকরিমুখী না করে ডিজিটাল প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে উদ্যোক্তামুখী করার কর্মকৌশল ও পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মডেল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। দেশের বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এরই মধ্যে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করেছে সরকার। বিনিয়োগকারীদের দেয়া হচ্ছে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধাও। এরই মধ্যে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপান, চীন, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশ

নানা ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছে। বিশ্বের পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়ায়ও ডিজিটাল প্রযুক্তি আনবে ব্যাপক পরিবর্তন। এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্য পাঠানোর খরচ অনেক কমে যাবে। ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে। বাংলাদেশও এর সুফল ভোগ করবে। এ বিপ্লবের সুফল পেতে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০১০ সালে সারা দেশে একযোগে ৪,৫০১টি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়। ইন্টারনেটের প্রসারের ফলে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা এখন সহজে যুক্ত হতে পারছে জ্ঞানের মহাসড়কে। এর পাশাপাশি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে ক্রমান্বয়ে রোবটিক্স, বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স কিংবা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য সরকার বিশেষায়িত ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৯টি হাইটেক ও সফটওয়্যার পার্ক তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে । এ বিপ্লবে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে দেশে প্রথম বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ১২ মে ২০১৮ মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার হবে। শিল্প কারখানায় রোবট ও অটোমেশন প্রযুক্তি কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি হ্রাস করবে, জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঔষধ তৈরির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের চাহিদা সৃষ্টি হবে, অস্ত্রোপচারে প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসা সেবাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করবে। ব্যাংক খাতে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ তথা সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা যাবে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে চতুর্থ শিল্প বিপবের জন্য তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'চতুর্থ শিল্পবিপবের ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে- (১) অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ, (২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবাহিনী সৃষ্টি, এবং (৩) পরিবেশ সংরক্ষণ।" ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণীতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে সংযুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ভিশন-২০৪১ উল্লেখযোগ্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় যাতে পিছিয়ে পড়তে না হয় তার জন্য সরকারের প্রণীত কৌশলপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

- **National Strategy for Robotics**
- **National Blockchain Strategy : Bangladesh**
- **National Internet of Things Strategy : Bangladesh**
- **National Strategy for Artificial Intelligence Bangladesh**
- **Microprocessor Design Capacity in Bangladesh**

কাঙ্ক্ষিত দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আত্তীকরণের লক্ষ্যে সরকার সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রকল্প গ্রহনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিটি সরকারি অফিসের সমন্বিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ): ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনায় ৪র্থ শিল্পবিপ্লবকে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বৈশ্বিক এ পরিবর্তনের মাঝে শুধুমাত্র স্বল্প দক্ষ শ্রমিক বা স্বল্প পুঁজি সম্বল করে বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয়। বিজয়ী তারাই হবেন যারা নতুন ধারণা, ব্যবসায়িক মডেল, পণ্য, পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভাবন চালিত ইকোসিস্টেমে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। ব্যতিক্রমী পণ্যসেবার পাশাপাশি নিয়ত পরিবর্তনশীল গ্রাহক চাহিদা পূরণে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলাকে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

Today's Wastages, Tomorrow's Shortage

কৃষি বিপ্লব ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে
দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে
রূপান্তরের ক্ষেত্রে দানাদার ইউরিয়া সার উৎপাদন
করে জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে
আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছি।

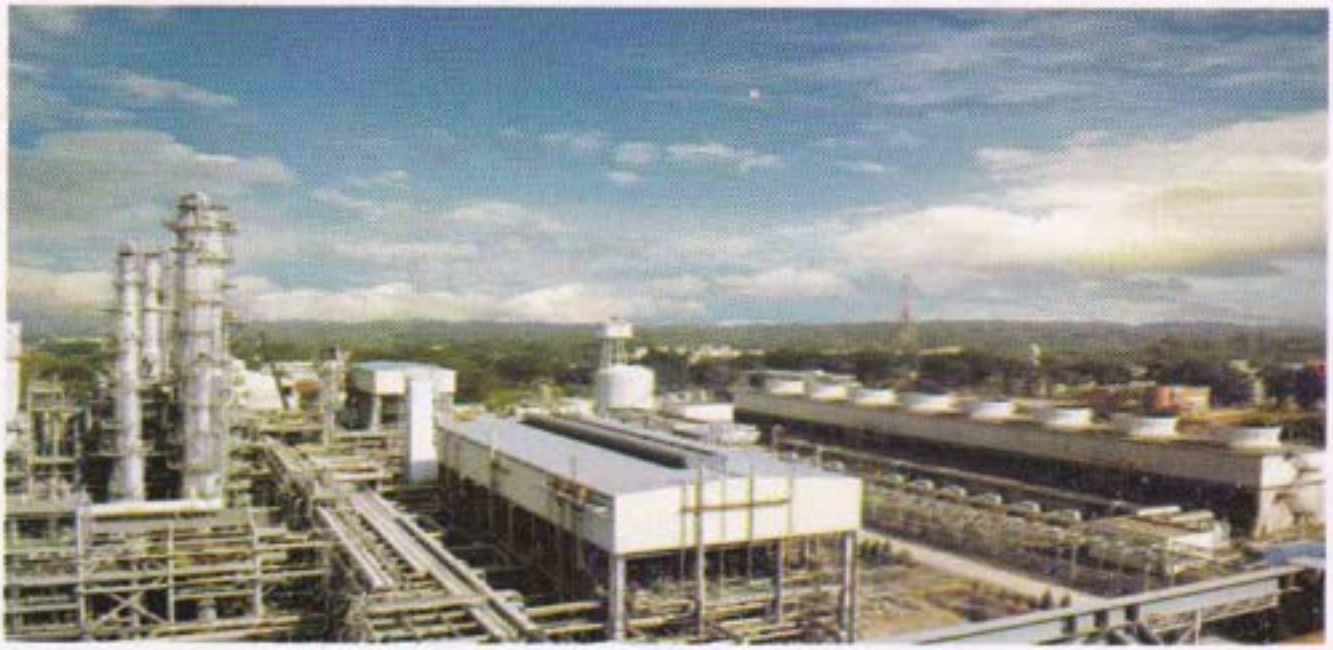

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান

NO.1
RFL
আর এফ এল
Brand In
BANGLADESH
We, RFL Plastics Believe Quality is Not an Act it's a Habit.
RFL Plastics is Uncompromising in its Product Quality.
That is Why RFL is the Number 1 Brand.
FURNITURE
STORAGE
FOOD
HOUSEHOLD
CLEANING
RFL
আর এফ এল
13 Factory
38,000 Employee
Over 3000 Plastics product
Serving 60 countries in the globe
Largest manufacturer in Bangladesh
www.rflplastics.com

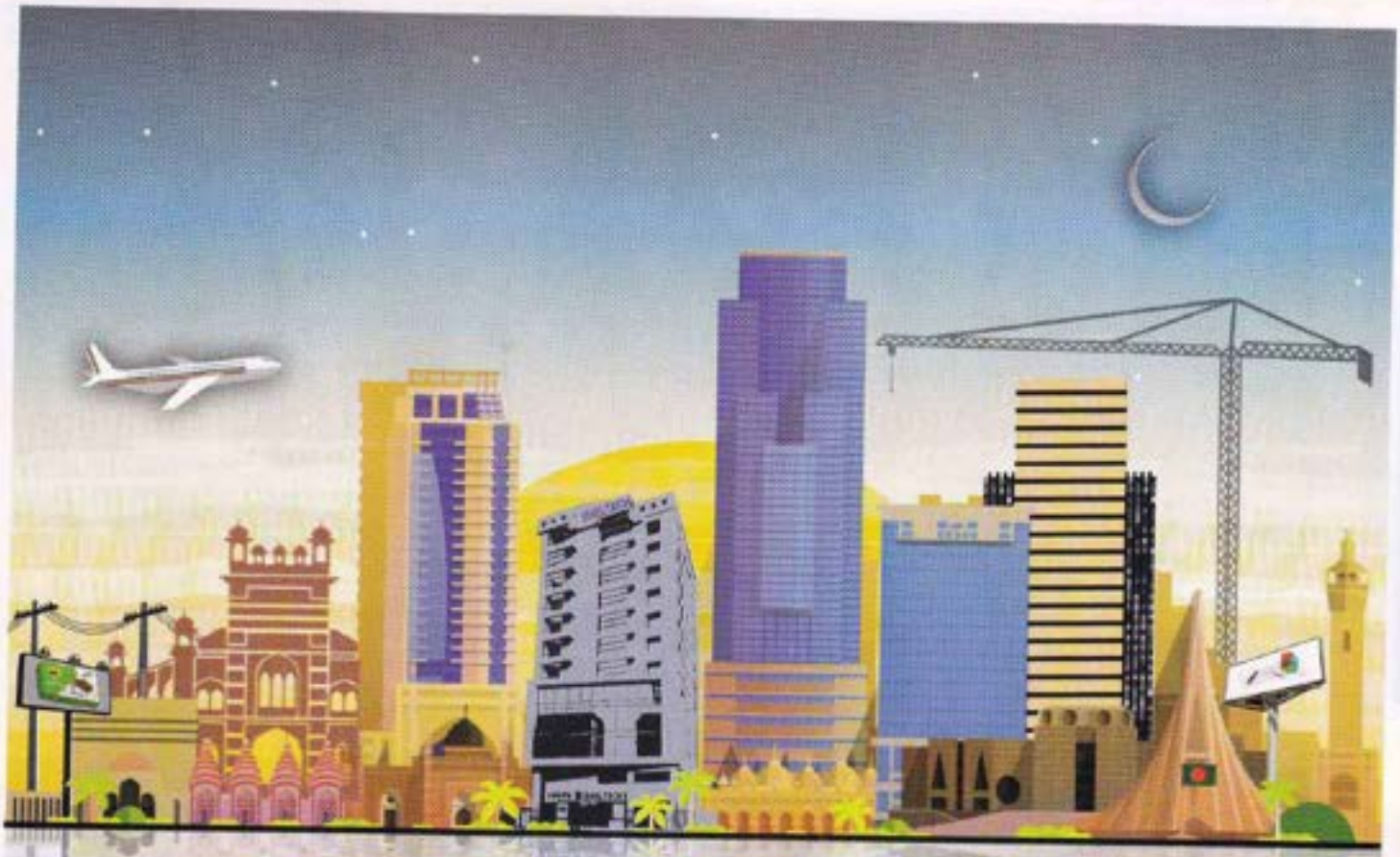

CHANGING LIVES
CHANGING BANGLADESH

SHELTECH GROUP

SINCE 1988

- Real Estate
- Ceramic Tiles (Floor + Wall) Manufacturing
- Hotel Chain
- Abrasive Paper Manufacturing
- SPC Pole Manufacturing
- Tea Estate
- Meat Processing
- Financial Institution (Stock Brokerage)
- Construction & Foundation Engineering
- Planning & Design Consultancy
- Freight Forwarding
- Online Property Solutions
- GSA for Airlines
- Estate Management

BRB
অন্যতম বিশ্বে...
...বাংলাদেশে শীর্ষে
আমাদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার
Since 1978
Achievements
President Award
Awarded by Honorable President
National Export Trophy (Gold)
Awarded by Honorable Prime Minister
Certification
CPRI
GL APPROVED
TÜV
Awards
BIZZ
NPO
বি এস টি আই অনুমোদিত
বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
ISO 9001-2015 certified company
web: www.brbcable.com

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রতিষ্ঠান

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ এর

উৎপাদিত চিনি, ভিনেগার, ডিনেচার্ড স্পিরিট ও অন্যান্য ডিস্টিলারী পণ্য ব্যবহার করুন

১। চিনি ঃ-

- আখ হতে উৎপাদিত স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কেরুজ চিনি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
- কেরুজ উৎপাদিত দেশীয় চিনি ১ কেজি / ২ কেজি প্যাকেটে বাজারজাত হচ্ছে।

২। ভিনেগার ঃ-

- কেরুজ মল্টেড ও সাদা ভিনেগার বাজারের সেরা।
- গুণে মানে ও স্বাদে অতুলনীয়।
- আচার, সস্ সংরক্ষণে অদ্বিতীয়।
- সুস্বাদু সালাদ তৈরিতে সর্বোত্তম।
- পরিপাকে সাহায্যকারী।

৩। ডিনেচার্ড স্পিরিট ঃ-

- কেরুজ ডিনেচার্ড স্পিরিট গুণে মানে অতুলনীয়।
- বার্ণিশের কাজে কেরুর ডিনেচার্ড স্পিরিট ব্যবহার করুন।

৪। কেরুজ জৈবসার ঃ-

- মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং মাটির বুনট ও গঠন উন্নত করে।
- মাটির পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি করে ও মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- গাছের পুষ্টি ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।
- মাটির অম্ল ও ক্ষারের সমতা বিধান করে।
- মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।
- কেরুজ জৈবসার দেশের একমাত্র সালফার সমৃদ্ধ জৈবসার-এ সার শতকে ২-৩ কেজি হারে প্রয়োগ করলে বাড়তি কোন সালফার ব্যবহার করতে হবে না।

৫। কেরু'জ হ্যান্ড স্যানিটাইজার

- হাত এবং ত্বক জীবাণুমুক্তকরণে হ্যান্ড স্যানিটাইজার একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল জীবাণুনাশক সলিউশন।

৬। আমাদের উৎপাদিত অন্যান্য ডিস্টিলারী পণ্য ব্যবহার করুন।

কেরুর পণ্য
গুণে মানে অনন্য

"বীমা ফসল হিসেবে অধিক আখ
আবাদ করে অধিক লাভবান হউন।"

কেরুর পণ্য
কিনে হউন ধন্য

বহুমুখি সেবার মাধ্যমে আমরা জনগণের বন্ধু হতে চাই।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ

(বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

ডাকঘর ঃ দর্শনা, জেলা ঃ চুয়াডাঙ্গা।

জার্মানীর প্রযুক্তি সম্পন্ন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রতীক ইষ্টার্ণ কেবলস্।

শর্ট সার্কিট জনিত অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা
এড়াতে ইষ্টার্ণ কেবলস্ ব্যবহার করুন।

এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে !!

ইষ্টার্ণ কেবলস্ লিমিটেড

নিরাপদ ও দীর্ঘ স্থায়ীত্বের প্রতীক

E-mail : info@easterncables.com, sales@easterncables.com
Web Site : www.easterncables.com, ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

We take it minute by minute, drop by drop, molecule by molecule. The miracle of a pyramid is in the perfection of every stone. The miracle of life is in the health of every cell. At Beximco Pharma, we are tireless at achieving such perfection in every molecule of our medicines. That's our little contribution to life. Here's to perfection. Here's to life.

BEXIMCO PHARMA
here's to life

Certified **US FDA** ☑ **TGA Australia** ☑ **Malta (EU)** ☑ **Health Canada** ☑ **WHO** ☑

খুশিলি রাবার ফ্যাক্টরী
রাবার যন্ত্রাংশ তৈরীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
BV সনদ প্রাপ্ত
মান সম্মত রাবার যন্ত্রাংশ সরবরাহের মাধ্যমে কাস্টমারের সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য
উন্নত কাঁচামাল ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের বিদেশী মেশিনে প্রতিটি রাবার স্পেয়ার্স তৈরী করা হয়।
প্রতিটি রাবার আইটেম কোয়ালিটি কন্ট্রোল সেল দ্বারা Qualified হওয়া সাপেক্ষে সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি Bureau Veritas দ্বারা সনদ প্রাপ্ত।
KSY RUBBER FACTORY
KHULNA SHIPYARD LIMITED
BANGLADESH NAVY, KHULNA
Phone: 02-477720003/02-44110990, Office: 01748-611565, 01917-947674
Fax: 02-477720404, E-mail: ksyrubberfactory2019@gmail.com
facebook.com/KSY-Rubber-Factory-102924021239046

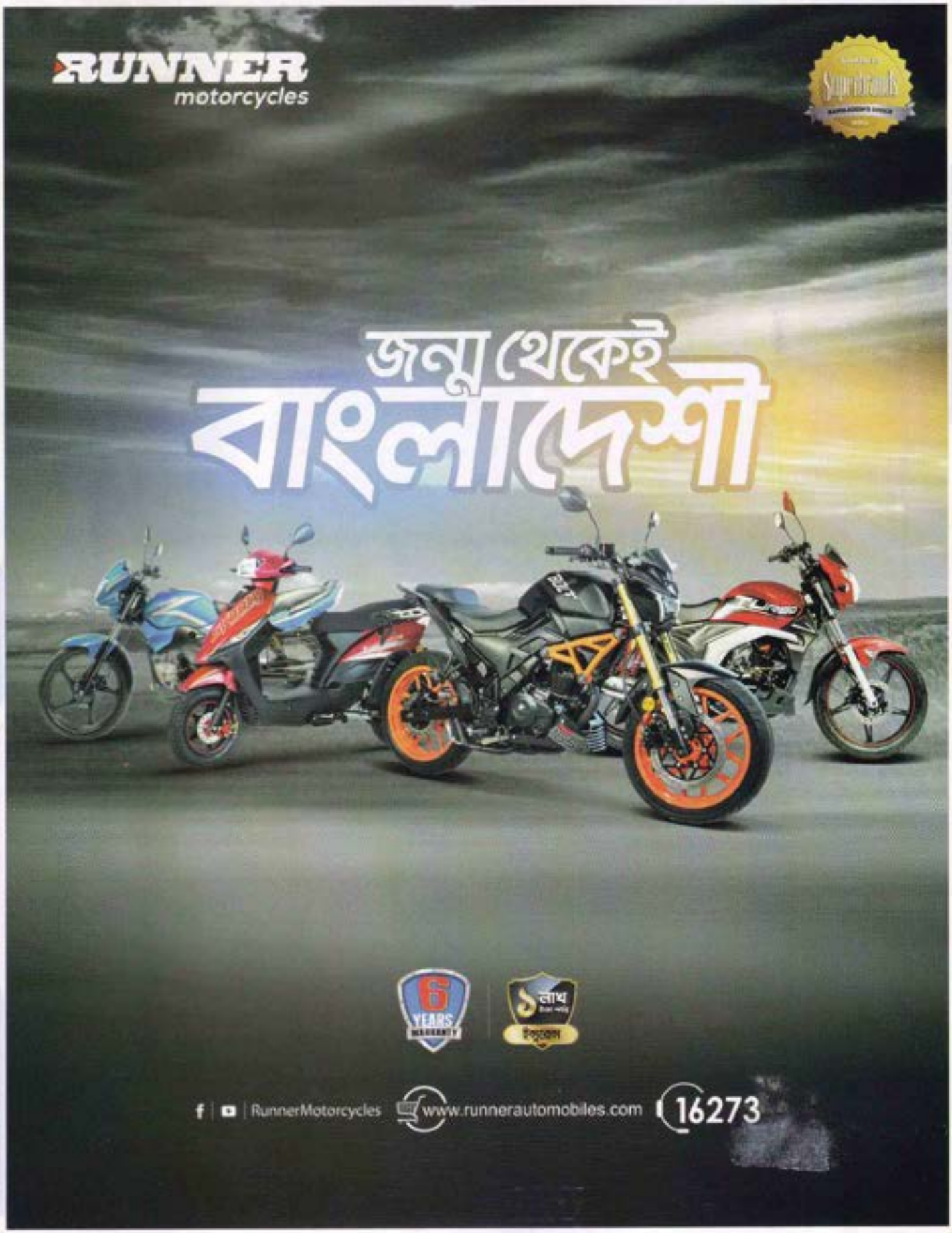

RUNNER
motorcycles
জন্ম থেকেই
বাংলাদেশী
6
YEARS
WARRANTY
১ লাখ
RunnerMotorcycles
www.runnerautomobiles.com
16273

মাসকোটেক্স লিমিটেড এর মাননীয় চেয়ারম্যান, জনাব এম. এ সবুর-কে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০২০" ট্রফি প্রদান করছেন জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়।

শিল্পখাতে মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ পুরস্কার পেল

মাসকোটেক্স লিমিটেড

বেসরকারী খাতে শিল্প স্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন, পণ্যের সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ক্ষমতা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ইত্যাদি বিবেচনায় শিল্পখাতে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০২০" অর্জন করে মাসকো গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মাসকোটেক্স লিমিটেড।

বেসরকারী শিল্পখাতের অবদান স্বরূপ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান একটি মহতি উদ্যোগ। মাসকো গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মাসকোটেক্স লিমিটেড-কে মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে টেক্সটাইল ও আরএমজি খাতে প্রথম স্থানে নির্বাচিত করায় আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। মাসকো গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান, জনাব এম. এ সবুর মনে করেন, এইভাবে শিল্পখাতকে রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃত করনের ধারা অব্যাহত থাকলে শিল্পখাতে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির উন্নত ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই খাতে জড়িত উদ্যোক্তারা অনুপ্রাণিত হবে। আমাদের সকল কর্মী, ক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যারা এই সাফল্য অর্জনে আমাদের সহযাগিতা করেছেন।

MASCO GROUP
Believes in Sustainable Continuous Development

"অপচয় রোধ করি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করি"

আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য
সেরা মানের উপাদানে তৈরি
রাঁধুনী
গুঁড়া মশলা
বিশ্বস্ত উৎস আর সযত্নে বাছাই করা সেরা উপাদানে তৈরি রাঁধুনী গুঁড়া মশলায় নিশ্চিত হয়
আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য।
রাঁধুনী
খাঁটি মান, খাঁটি স্বাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিয়র-এ

ইউনিভার্সেল জিন্স এর পক্ষ থেকে আন্তরিক

অভিনন্দন

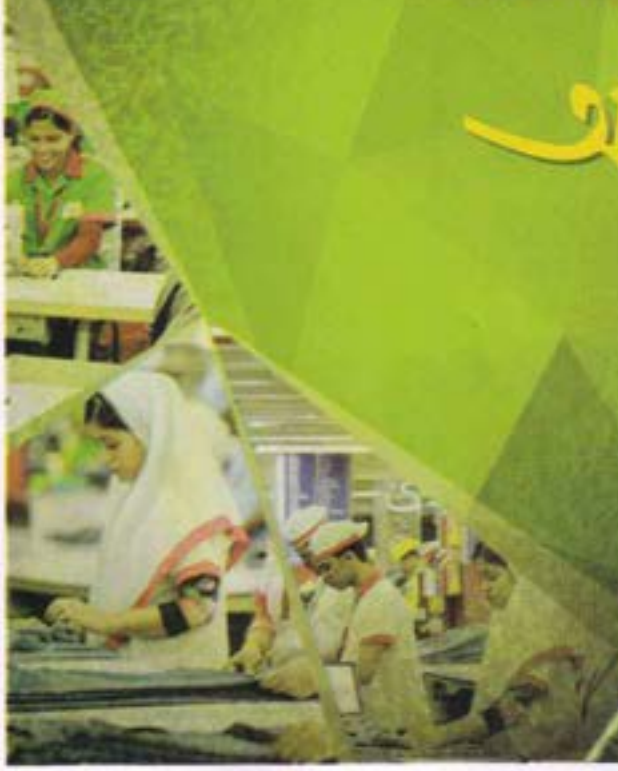

UNIVERSAL
JEANS

Receiving 'Best Employment Provider' Award

DIGICON™

Digicon Technologies Ltd. is a leading outsourcing organization in Bangladesh, with an industry leading edge in the vertical of BPO and IT/ITES solutions. We have enlisted many of the world's prestigious companies as well as diverse government agencies through our dynamic solution mechanism.

About Us

- ISO 9001:2015 Certified
- ISO/IEC 27001:2013 Certified
- 4 Service Points
- 3M monthly transactions
- 11+ Years in Market
- 26+ Clients

Service Offerings

Customer Interaction
Customer Care, Inbound / Outbound, Collections / Retention, Product Support, Quality Assessment

Back Office
Finance and Accounting, HR Outsourcing, Document Management Services, Transaction Processing

Non-Voice / Digital Engagement
Social Media Management, Digital Marketing & E-Commerce, Complaint Management

Solution / Application
Customer Relationship Management (CRM), Complaint Management System (CMS), Contact Solution, Apps

Happily Serving

Public Sector

Private Sector

Achievements

National Productivity And Quality Excellence Award 2020

Best Employer Brand Awards 2019

Best Employment Provider Award

Innovation Towards Improved Efficiency

242/A Tejgaon I/A, Gulshan Link Road, Dhaka-1208, Bangladesh | info@digicontechnologies.com
09610-110110 | www.digicontechnologies.com
www.facebook.com/digiconbpo

SECTOR'S CONTRIBUTION

Share in GDP	4.99 %	Employment Generation	1.8 Million
Poverty Reduction	7.6 %	Banking & Insurance	258 Billion BDT
Export Destination (No. of Countries)	161	Knitwear Export (FY 2020-21)	$ 23.21 Billion
Female Empowerment	65 %	Shipping & Logistics Industry	$ 140 Million USD
Share in Apparel Export	54.47 %	Forward & Backward Linkage	$7.98 Billion USD
Share in National Export	44.56 %		

COOPERATIVE PARTNERS

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK · EUROPEAN UNION · giz · JICA · ILO · UNIDO

www.bkmea.com

Head Office: Press Club Building (1st & 3rd Floor), 20/1 Bangabandhu Road, Narayanganj-1400, Bangladesh. Phone: [illegible], Fax: [illegible]
Dhaka Office: Platinum Tower (4th Floor) 13/A, Sonargaon Road, Banglamotor, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: [illegible], Fax: [illegible]
Chittagong Office: Chamber House (4th Floor) 38, Agrabad C.A, Chittagong-4100, Bangladesh. Phone: 031-2514342, Fax: 031-2514345

টি এস পি সার

অধিক ফলনের জন্য জমিতে টি এস পি কমপ্লেক্স লিঃ - এ উৎপাদিত টি এস পি সার ব্যবহার করুন

টি এস পি সার ফসফেট সমৃদ্ধ একটি উৎকৃষ্ট সার

টি এস পি সার-

- ★ গাছের প্রথম পর্যায়ে বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।
- ★ উদ্ভিদের জীবকোষের বিভাজনে অংশ নেয়।
- ★ গাছের মূল গঠন করে।
- ★ গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- ★ সময়মত গাছে ফুল এবং ফল আসতে সাহায্য করে।

টি এস পি কমপ্লেক্স লিঃ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম

SaRa
LIFESTYLE LTD
SCAN US
Website
Facebook
Shop Location
www.saralifestyle.com.bd
Helpline: +8801885 998899

Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) Limited has a long heritage of being one of the firstborn company of Bangladesh Since its inception in 1956. The Company is considered a pioneer in producing and marketing Fast Moving Consumer Goods (FMCG); particularly, operative in personal care, cosmetics, household and toiletries categories.The company is much more passionate about producing and marketing products of world class quality and, thereby delivering the very best to the consumers. Flagship brands like **SANDALINA, TIBET** and **FAST WASH** have already won the hearts & minds of million of consumers in Bangladesh.

প্রিমিয়ার সিমেন্ট
নতুন প্রযুক্তিতে আরও আকর্ষণীয়
নতুন ব্যাগে
প্রিমিয়ার সিমেন্ট
PREMIER cement
আকর্ষণীয় রং
স্পেশাল, গোল্ড, এডভান্সড
ঢালাইয়ের রাজা
ডিআরএস ডেনমার্ক
(Consistent Quality)
গর্বিত নির্মাণ সহযোগী
আমরা প্রমাণে বিশ্বাসী
কর্পোরেট অফিস: টি.কে. ভবন (১২তম তলা), ১৩ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
info@premiercement.com
www.premiercement.com